বেতাল পঞ্চবিংশতি
বত্রিশ সিংহাসন

ভাষান্তর
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

॥ বাণীপ্রকাশ ॥
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক
আখতার হোসেন
বাণীপ্রকাশ
কলকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
১২ই ভাদ্র ১৩৬৩

প্রচ্ছদ : দেব দত্ত

মুদ্রাকর
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য
করুণাময়ী প্রেস, ৯/৭ বি, প্যারীমোহন সুর লেন,
কলকাতা-৯

বেতাল
পঞ্চবিংশতি

বত্রিশ
সিংহাসন

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্বসেনের চার রাণী ও ছয় পুত্র। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কু রাজা হন। রাজার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞ হলেও রাজ্য-লোভ সামলাতে না পেরে তাঁর বড় ভাই শঙ্কুকে হত্যা করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন। তারপর আপন শক্তিবলে লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে প্রভূত নামযশ অর্জন করেন।

রাজা হওয়ার পর বিক্রমাদিত্য একদিন ভাবতে লাগলেন, রাজার কাজ হলো প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু আমি আত্মসুখে মগ্ন হয়ে মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি। রাজ্যের প্রজাদের হিতাহিত ও সুখ সুবিধার কথা কিছু ভাবি না। আমার রাজ্যের প্রজারা কি অবস্থায় আছে, রাজকর্মচারীরা প্রজাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্য সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ানো উচিত আমার। তা না করলে রাজধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করা হবে না।

এই ভেবে তিনি তাঁর এক ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সারা রাজ্যময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সেকালে উজ্জয়িনী নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁর দারিদ্র্য দূর করার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে ইষ্টদেবতা তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে একটি ফলদান করেন।

এই ফল পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, দেবতা আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে এই ফল ·দিয়ে বলেছেন, এই ফল খেলে যে কোন মানুষ জরাব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে অমর হবে।

একথা শুনে ব্রাহ্মণী রেগে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা মানেই ত কষ্টভোগ করে যাওয়া অনন্তকাল ধরে। এখন বরং মৃত্যু হলে সংসার [illegible] থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। তুমি বরং এই ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়ে তার বিনিময়ে কিছু অর্থ নিয়ে এস যাতে আমরা ভালভাবে সংসার চালাতে পারি।

ব্রাহ্মণ তখন রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, এই ফলটি খেলে আপনি অমরত্ব লাভ করবেন। তাহলে রাজ্যের মঙ্গল হবে। এই ফলটি নিয়ে আমায় কিছু অর্থ দিন।

রাজা তখন সেই ফলটি নিয়ে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন ব্রাহ্মণকে।

রাজা সেই ফলটি তাঁর রাণীকে দিয়ে বললেন, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। এই ফল খেয়ে তুমি অমর ও চিরযৌবনা হবে।

মথুরা থেকে আনা এক ভৃত্য সেই রাণীর প্রিয়পাত্র ছিল। রাণী তাকে সেই ফলটি দিয়ে দিল। সেই ভৃত্য আবার তার প্রেমিকা এক বারাঙ্গনাকে দিয়ে দিল ফলটি।

বারাঙ্গনা ফল পেয়ে ভাবল, এই ফল খেয়ে আমি অমর হলে তাতে কোন লাভ হবে না। তাতে আমার বিড়ম্বনাই বাড়বে। কারণ আমাকে হীন কাজ করে সারা জীবন কাটাতে হবে। তার থেকে রাজাকে এই ফলটি দিলে তা খেয়ে তিনি অমর হলে দেশের মঙ্গল হবে।

এই ভেবে রাজার কাছে গিয়ে সেই বারাঙ্গনা বলল, মহারাজ, এই ফল খেলে মানুষ অমর হয়। আপনি এই ফলটি নিয়ে খান।

বারাঙ্গনার হাতে ফলটি দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন রাজা। যে ফল তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে দিয়েছেন তা কি করে বারাঙ্গনার হাতে এল তা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

তখন সেই বারাঙ্গনা ও রাণীর প্রিয়পাত্র ভৃত্যের কাছ থেকে একে একে সব কথা জানতে পারলেন রাজা।

সব কিছু জেনে তিনি রাণীমহলে সেই রাণীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমাকে যে ফলটি দিয়েছি তা কোথায় ?

রাণী বলল, আমি তা খেয়ে ফেলেছি।

রাজা তখন সেই ফলটি রাণীকে দেখিয়ে বললেন, এ ফল বারাঙ্গনার হাতে কি করে গেল ?

রাণী তখন তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় ও ভয়ে চুপ করে রইল।

রাজা তখন আর কিছু না বলে রাণীমহল থেকে চলে এলেন। যাকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁর সঙ্গে। সংসার অনিত্য, অসার। সেখানে প্রেম প্রীতি ও বিশ্বাসের কোন দাম নেই।

এই সব ভেবে রাজবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেন রাজা ভর্তৃহরি। বনে গিয়ে নির্জনে যোগসাধনা করতে লাগলেন।

উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন শূন্য হয়ে থাকায় দেশে অরাজকতা চলতে লাগল। তা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র একজন যক্ষকে নগররক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। যক্ষ নগর রক্ষা করতে লাগল।

এদিকে রাজা ভর্তৃহরি রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করে তপস্বী হয়ে বনে চলে

গছেন এবং রাজসিংহাসন শূন্য পড়ে আছে এই সংবাদ দেশে দেশে প্রচার য়ে গেল। ক্রমে সে সংবাদ রাজা বিক্রমাদিত্যেরও কানে গেল।

এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এলেন বিক্রমাদিত্য। তিনি থন নগরে প্রবেশ করলেন তখন রাত্রি গভীর। নগররক্ষক যক্ষ নগর পাহারা দচ্ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যকে চিনতে না পেরে যক্ষ বলল, দেবরাজ আমায় এই গরের রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া অসময়ে কাউকে প্রবেশ রতে দেব না নগরে।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। দেশভ্রমণের পর আমার জ্যে ফিরে এসেছি আমি।

যক্ষ বলল, তুমি যদি রাজা হও তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধে তার পরিচয় াও।

এই কথা শুনে রাজা যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে যক্ষকে হারিয়ে য়ে তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলেন রাজা।

যক্ষ তখন বলল, মহারাজ, আমি পরাজিত। আমি বুঝতে পারলাম, তুমি থার্থই রাজা। এখন তুমি আমায় ছেড়ে দাও। তার বিনিময়ে আমি তোমার ীবন রক্ষা করব।

রাজা বললেন, তুমি আমার জীবন রক্ষা করবে কি করে? ইচ্ছা করলে মিই ত তোমার প্রাণনাশ করতে পারি।

যক্ষ বলল, একথা সত্য। তবে সত্যিই তোমার মৃত্যু আসন্ন। আমার সব থা শুনে সেইমত কাজ করলে তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে রাজত্ব করতে পারবে।

একথা শুনে কৌতূহলী হয়ে রাজা যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়লেন।

যক্ষ তখন বলতে লাগল, ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক রাজা লেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে বনে গিয়ে দেখেন, এক সাধু একটি ছের সঙ্গে পা দুটি বেঁধে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলতে ঝুলতে ধ্যান রছে। রাজা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সাধু এইভাবে অনেক বছর ধরে পস্যা করছে, সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। যাই হোক, তিনি তখনি বাড়ি রে এলেন।

পরদিন রাজসভায় রাজা তাঁর মন্ত্রীদের বললেন, গতকাল বনে গিয়ে এক দ্ভুত মৌনী সাধুকে দেখেছি। যদি কেউ সেই সাধুকে এখানে আনতে পারে াহলে তাকে এক লক্ষ মুদ্রা উপহার দেব।

নগরে এই কথা ঘোষণা করে দেওয়া হলো। এক বারবনিতা তা শুনে রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে আমি ঐ সাধুকে বশ করে ঐ সাধুর ঔরসে এক পুত্র জন্মিয়ে সেই পুত্রকে তার কাঁধে চাপিয়ে আপনার রাজসভায় নিয়ে আসব।

রাজা একথা শুনে আশ্চর্য হলেন। তিনি বারবনিতাকে অনুমতি দিলে সে তখনি বনের মধ্যে সাধুর আশ্রমে চলে গেল। সে দেখল, সত্যিই সাধু একটি গাছে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলছে। কোন কথা বলছে না।

হঠাৎ সাধুর তপস্যা ভঙ্গ করা উচিত হবে না ভেবে বারবনিতা কাছাকাছি একটা কুঁড়ে তৈরি করে বাস করতে লাগল। পরদিন সে কিছু মোহনভোগ তৈরি করে এনে সাধুর মুখে তুলে দিল। সাধু তা খেতে লাগল। বারাঙ্গনা তাকে খাইয়ে দিতে লাগল। এইভাবে রোজ সে সাধুকে মোহনভোগ খাওয়াতে লাগল।

সাধু তখন শরীরে বল পেয়ে একদিন বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? কিজন্য এখানে এসেছ?

বারাঙ্গনা সাধুর মন ভোলাবার জন্য মিথ্যা করে বলল, আমি এক দেব-কন্যা। আমি তীর্থ করার জন্য মর্ত্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুদিন হলো এই বনে এসে এক আশ্রম তৈরি করে যোগসাধনা করছি।

বারাঙ্গনার রূপ ও মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল সাধু। সে বলল, আমাকে তোমার আশ্রমে নিয়ে চল।

বারাঙ্গনা সাধুকে তার আশ্রমে নিয়ে গিয়ে ভাল মিষ্টি খেতে দিল। সাধু তার সাধনা ছেড়ে সেই দিনই বিয়ে করল বারাঙ্গনাকে। কালক্রমে তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল।

এর কিছুদিন পর বারাঙ্গনা সাধুকে বলল, আমরা যোগসাধনা ছেড়ে অনেকদিন এক জায়গায় বাস করছি। ভোগসুখে মত্ত হয়ে আছি। এখন তীর্থযাত্রা করে দেহ পবিত্র করা উচিত।

বারাঙ্গনার কথায় সাধুও রাজী হয়ে গেল। একদিন তারা আশ্রম ছেড়ে তীর্থ যাত্রা করল। বারাঙ্গনা কৌশলে সাধুর কাঁধে তার ছেলেটাকে চাপিয়ে দিল। এইভাবে দুজনে পথ চলতে লাগল তারা।

বারাঙ্গনা সোজা চন্দ্রভানুর রাজসভায় গিয়ে উঠল। সাধু কিছু বুঝতে পারল না।

এদিকে বারাঙ্গনা আর সাধুর কাঁধে ছেলে দেখে রাজার সব কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, বারাঙ্গনা একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজ তা পূরণ করে ফিরে এসেছে। সে কৌশলে সাধুকে বশ করে শুকনো গাছে যেন ফুল ফুটিয়েছে।

সকলেই বারাঙ্গনাকে দেখে তাকে চিনতে পারল। রাজার কথা শুনে সাধুর চৈতন্য হলো। সে বুঝতে পারল এই বারাঙ্গনা রাজার সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করে তার তপস্যা ভেঙ্গেছে। সে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তাকে মুগ্ধ করে গৃহী করে তুলেছে।

সে মনে মনে বলতে লাগল, আমিও অধম। তাই বারাঙ্গনার রূপের মোহে এতদিনের সাধনার সব ফল বিনষ্ট করলাম।

এর পর সে রেগে গিয়ে ছেলেটাকে তার কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। অন্য এক দূর বনে গিয়ে নতুন করে তপস্যা শুরু করল। পরে রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে সেই সাধু।

এই কাহিনী শেষ করে যক্ষ বলল, তুমি, রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ সাধু এক নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তুমি রাজা হয়েছ, চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে রাজা হয়েছে। আর ঐ সাধু কুমোরের ঘরে জন্মে যোগসাধনা করে সাধু হয়েছে। ঐ সাধু রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে ও তাঁকে বেতাল করে শ্মশানের কাছে এক শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এবার তোমাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে এবং তোমাকে হত্যা করতে পারলে তার সংকল্প পূর্ণ হবে। তুমি যদি তার হাত থেকে কোনরকমে নিস্তার পেতে পার তাহলে বিনা বাধায় অনেকদিন রাজত্ব করতে পারবে।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল যক্ষ।

পরদিন সকালেই সিংহাসনে বসে সভাসদদের নিয়ে রাজ্যশাসন করতে শুরু করলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

কিছুদিন পর শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী একটি ফল এনে রাজাকে তা দিয়ে চলে গেল। সন্ন্যাসী চলে গেলে রাজা ভাবতে লাগলেন, যক্ষ যে সাধুর কথা বলেছিল এই সন্ন্যাসী সেই সাধু কিনা।

যাই হোক, ফলটি তখন না খেয়ে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে ফলটি কোষাগারে রেখে দিতে বললেন রাজা।

এর পর থেকে প্রতিদিন রাজাকে একটি করে ফল দিয়ে যেতে লাগল সন্ন্যাসী।

একদিন রাজা যখন অশ্বশালা পরিদর্শন করেছিলেন তখন সন্ন্যাসী এ রোজকার মত একটি ফল দিলেন তাঁকে। ফলটি রাজার হাতে দেবার স রাজার হাত থেকে তা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফলটি ফেটে গেল এবং ত থেকে একটি উজ্জ্বল রত্ন বার হলো।

তা দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপ কিজন্য আমাকে এই রত্নগর্ভ ফলটি দিলেন ?

সাধু বলল, মহারাজ, শাস্ত্রে আছে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ আর চিকি সকের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। এইজন্যই আমি রত্নগর্ভ শ্রীফল নি এসেছিলাম। আমি আপনাকে এর আগে প্রতিদিন যে সব ফল দিয়ে তাদের মধ্যেও একটি করে রত্ন আছে।

রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে যত ফল রাখ দিয়েছি। সেগুলি সব নিয়ে এস।

কোষাধ্যক্ষ সব ফল নিয়ে এলে রাজা সেগুলি ভেঙ্গে দেখলেন প্রতি ফলের মধ্যেই একটি করে রত্ন আছে। তা দেখে রাজা আশ্চর্য ও আনন্দি হলেন।

এর পর তিনি রাজসভায় গিয়ে একজন স্বর্ণকারকে ডেকে বললেন, এ সব রত্নগুলি পরীক্ষা করে এদের সঠিক মূল্য ঠিক করে দাও।

স্বর্ণকার রত্নগুলি পরীক্ষা করার পর রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ এগুলি অমূল্য রত্ন, এক কোটি টাকারও বেশী।

রাজা তখন সাধুকে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, প্রভু, আমার সমগ্র সাম্রাজ্যও এই রত্নগুলির সমান হবে না। আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এই রত্নগুলি কোথায় পেলেন এবং কেনই বা এগুলি আমায় দান করলেন তা জানতে ইচ্ছা করছে।

সন্ন্যাসী বলল, যদি অনুমতি দেন ত নির্জনে গিয়ে বলি।

রাজা তখন সন্ন্যাসীকে নির্জনে নিয়ে গেলে সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ গোদাবরী নদীর তীরে আমি এক শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধ করব বলে ঠিক করেছি তাহলে আমার অনেক ক্ষমতা লাভ হবে। আপনার কাছে আমার প্রার্থন একদিন আপনি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারা রাত্রি আমার কাছে উপস্থি থাকবেন। তাহলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

রাজা বললেন, আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনি দিন ঠিক করে দিন।

সন্ন্যাসী বলল, আপনি আগামী ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যা-বেলায় একা সেখানে যাবেন।

রাজা বললেন, আমি অবশ্যই আপনার আশ্রমে যথাসময়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

রাজাকে এইভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে সন্ন্যাসী তার আশ্রমে ফিরে গেল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যাবেলায় ধ্যানে বসল সন্ন্যাসী। রাজা বিক্রমাদিত্য যথাসময়ে একা তরোয়াল হাতে সাহসের সঙ্গে অন্ধকার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আশ্রমে গিয়ে রাজা দেখলেন, সন্ন্যাসী শ্মশানে বসে একটি মাথার খুলি বাজাচ্ছে আর যত সব ভূত প্রেত পিশাচ নাচছে।

রাজা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, ভৃত্য উপস্থিত। আদেশ দিন, কি করতে হবে।

সন্ন্যাসী রাজাকে একটি পাতার আসনে বসিয়ে বলল, মহারাজ, আপনার কথায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বুঝলাম সৎ লোকেরা প্রাণ দিয়েও সত্য পালন করে। এসেছেন যখন একটা কাজ করুন। এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে দক্ষিণ দিকে একটা শ্মশান আছে। সেখানে একটা শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝুলছে। সেই মড়াটাকে অবিলম্বে নিয়ে আসুন আমার কাছে।

রাজাকে এই আদেশ দিয়ে যোগাসনে বসল সন্ন্যাসী। রাজা তখনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে একা এগিয়ে যেতে লাগলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনি বরাবরই নির্ভীক। কোন অবস্থাতেই ভয় পান না তিনি। একে অন্ধকার। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। পথের দুদিক থেকে ভূত প্রেতদের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ আসছিল।

অবশেষে সেই শ্মশানে গিয়ে রাজা দেখলেন, সত্যিই একটা শিরীষ গাছে উপর দিকে পা আর নিচের দিকে মাথা করে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা মড়া ঝুলছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য তখন বুঝতে পারলেন যক্ষের কথাই ঠিক। এই মড়াটি হলো সেই তেলী রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ সন্ন্যাসীই সেই কুমোর যে যোগসিদ্ধির দ্বারা মৃত রাজা চন্দ্রভানুকে বেতাল করে রেখেছে।

কোন রকম ভয় না করে গাছে উঠে তরোয়াল দিয়ে মড়ার বাঁধনগুলো কেটে দিলেন রাজা। মড়াটা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েই কাঁদতে লাগল মানুষের মত। রাজা বিক্রমাদিত্য তখন আশ্চর্য হয়ে মড়াটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি, কিকরে তোমার এ অবস্থা হলো ?

কথাটা শুনে হাসতে লাগল মড়াটা। সে আবার গাছে উঠে ঝুলে রইল তেমনি করে। রাজা আবার গাছে উঠে দড়ির বাঁধন কেটে দিতে মড়াটা আবার পড়ে গেল। রাজা তাকে আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু মড়াটা এবার কোন উত্তর দিল না দেখে চাদর জড়িয়ে মড়াটাকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন তিনি।

রাজা দুপা এগিয়ে যেতেই মড়া বা বেতাল বলে উঠল, কে তুমি বীর-পুরুষ ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসীর আদেশে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তাঁর কাছে।

বেতাল বলল, চুপ করে পথ চলতে নেই। বুদ্ধিমানরা কথা বলতে বলতে পথ চলে। আমি তোমাকে পথ চলতে চলতে কতকগুলি গল্প বলব। প্রত্যেকটি গল্প শেষ করে প্রশ্ন করব। যদি তার সঠিক উত্তর দিতে পার তাহলে আমি আবার গাছে ফিরে যাব আর যদি তুমি জেনেও ভুল উত্তর দাও তাহলে বুক ফেটে মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

রাজা এ কথায় বাধ্য হয়ে রাজী হয়ে পথ চলতে লাগলেন। বেতালও তার প্রথম গল্প বলতে শুরু করল।

প্রথম কাহিনী

সেকালে বারানসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন। বজ্রমুকুট নামে রাজার একটিমাত্র ছেলে ছিল। রাজা রাণী দুজনেই তাঁদের ছেলেকে খুব ভালবাসত।

একদিন রাজপুত্র বজ্রমুকুট তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে করে মৃগয়া করতে গিয়ে এক গভীর বনে ঢুকে পড়ে। সেই বনের মধ্যে একটা গাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এক সরোবরে স্নান করল রাজপুত্র। স্নান সেরে কাছে একটি শিবমন্দির দেখে সেই মন্দিরে গিয়ে পূজা করে বেরিয়ে এসে

দেখল এক রাজকন্যা তার সহচরীদের সঙ্গে সরোবরের অপর পারে স্নান ও পূজো করে গাছের ছায়ায় বেড়াচ্ছে।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ হলো। রাজকন্যা রাজপুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার মাথায় খোঁপা থেকে একটি পদ্মফুল নিয়ে কানে পরল। তারপর কান থেকে ফুলটি খুলে দাঁতে কাটল। শেষে মাটিতে ফেলে দিয়ে যাবার সময় আবার ফুলটি কুড়িয়ে নিজের বুকে রাখল। সাথীদের সঙ্গে যাবার সময় রাজকুমারের দিকে বারবার তাকাতে লালল।

রাজকন্যার এই সব কাজের কোন মানে বুঝতে পারল না রাজপুত্র বজ্রমুকুট। সে মন্ত্রীপুত্রকে ডেকে রাজকন্যার কথা বলল।

রাজপুত্র প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শুধু রাজকন্যার কথা ভাবতে লাগল। কোন কাজ বা আমোদ প্রমোদে মন দিতে পারল না সে। স্নান খাওয়া প্রায় ত্যাগ করল। দিনে দিনে শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল তার। তার এই অবস্থা দেখে মন্ত্রীদের ভাবনা হতে লাগল।

একদিন রাজপুত্র তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে বলল, আমি ঐ রাজকন্যাকে বিয়ে করতে না পারলে বাঁচব না। আমি এ প্রাণ আর রাখব না।

মন্ত্রীপুত্র বলল, রাজকন্যা যাবার সময় তোমায় কোন কথা বলে গিয়েছিল ?

রাজপুত্র বলল, না মুখে কোন কথাই বলেনি আমাকে।

এরপর পদ্মফুলের ঘটনাটি সব বলল।

মন্ত্রীপুত্র খুশি হয়ে বলল, এই সব সঙ্কেতের মাধ্যমেই রাজকন্যা তার সব কথা জানিয়ে গেছে।

বজ্রমুকুট উৎসুক হয়ে বলল, কিকরে বুঝলে ?

মন্ত্রীপুত্র বলল, মাথার খোঁপা থেকে ফুল নিয়ে কানে পরার মানে হলো, রাজকন্যা কর্ণাট নগরে থাকে। সেই ফুল দাঁতে কাটার মানে হলো তার বাবার নাম দন্তকাট। মাটিতে ফুল ছোঁড়ার মানে তার নাম পদ্মাবতী। আবার সেই ফুল কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়ার মানে তুমি তার হৃদয় বল্লভ।

রাজপুত্র বজ্রমুকুট তখন বলল, বন্ধু, আমাকে তাহলে কর্ণাট নগরে নিয়ে চল।

তখন তারা দুই বন্ধুতে মিলে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কর্ণাটের পথে রওনা হয়ে গেল।

কর্ণাট নগরের সামনে এসে একটি কুঁড়ে ঘর দেখে তারা নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। দেখল, সেই কুঁড়ের সামনে একজন বুড়ী বসে আছে। তারা

বুড়ীকে বলল, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি এই নগরে। আমাদের থাকবার জায়গা দিতে পার ?

বুড়ী বলল, তোমরা এটাকে নিজের বাড়ি মনে করে যতদিন খুশি থাকতে পার।

তারা বলল, এই ঘরে তোমার আর কে কে থাকে ?

বুড়ী বলল, আমার একটিমাত্র ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। আমার ছেলে রাজবাড়িতে কাজ করে। আমি আগে রাজকন্যা পদ্মাবতীর ধাইমা ছিলাম। এখন বুড়ো হয়েছি বলে ঘরে থাকি। তবে রাজা আমায় অন্নবস্ত্র দেন। আজও আমি রোজ একবার করে রাজকন্যাকে দেখতে যাই।

রাজকুমার বজ্রমুকুট তখন বুড়ীকে বলল, তুমি কাল রাজবাড়িতে গিয়ে রাজকন্যাকে বলবে শুক্লাপঞ্চমীতে সরোবরের ধারে সে যে রাজপুত্রকে দেখেছিল সে তার সংকেত বুঝে এখানে এসেছে।

বুড়ী বলল, কাল কেন আমি এখনি যাচ্ছি।

এই বলে সে লাঠি হাতে তখনি রাজবাড়ি চলে গেল। গিয়ে দেখল রাজকন্যা পদ্মাবতী একা একা বসে কি ভাবছে।

বুড়ী তাকে বলল, বাছা, তুমি সরোবরের ধারে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলে সে এখন আমার বাড়িতে আছে। সে রূপে গুণে সব দিক দিয়ে তোমার যোগ্য। তুমি তাকে বিয়ে করতে পার।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা রেগে গিয়ে বুড়ীর দুই গালে দুই চড় মেরে তাকে তাড়িয়ে দিল।

বুড়ী ফিরে এসে রাজপুত্রকে এ কথা জানাল। তা জেনে হতাশ হয়ে পড়ল রাজপুত্র।

কিন্তু মন্ত্রীপুত্র বলল, এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বুড়ীর দুই গালে দু চড় মেরে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে রাজকন্যা বোঝাতে চেয়েছে দশ দিন পর শুক্লপক্ষের শেষে তার সঙ্গে দেখা হবে তোমার।

দশদিন পর বুড়ী আবার রাজবাড়িতে গিয়ে রাজকন্যাকে আবার সেই কথা বলল। কিন্তু রাজকন্যা তাকে এবার গলাধাক্কা দিয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে বার করে দিল।

বুড়ী ফিরে এসে সেকথা রাজপুত্রকে জানাতে আবার সে ভেঙ্গে পড়ল হতাশায়।

মন্ত্রীপুত্র বলল, ভেবো না, এটাও একটা সঙ্কেত। বুড়ীকে খিড়কী দরজা

দিয়ে বার করে দেবার মানে হলো রাতে তুমি খিড়কী দরজা দিয়ে রাজবাড়ির অন্দরমহলে যাবে।

রাজপুত্র খুশি হয়ে সন্ধ্যা হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যার সময় ভাল পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল সে। মন্ত্রীপুত্র তাকে রাজবাড়ির খিড়কী দরজা পর্যন্ত দিয়ে এল।

অন্দরমহলে গিয়ে রাজপুত্র দেখল সত্যিই রাজকন্যা পদ্মাবতী তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে। রাজপুত্রকে দেখে সে খুশি হলো। সেই রাতেই গন্ধর্ব মতে বিয়ে হলো তাদের। সুখে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে রাজকুমার চলে যেতে চাইলে রাজকন্যা তাকে ছাড়ল না। ফলে রাজকুমার বজ্রমুকুট রাজকন্যার কাছেই রয়ে গেল।

এইভাবে এক মাস কেটে যাবার পরও রাজকন্যা দেশে ফিরতে দিল না রাজপুত্রকে। অথচ দেশে ফেরার ও তার বন্ধুকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল রাজপুত্রের মন। সে দিনরাত শুধু তার বন্ধুর কথা ভাবত। সে শুধু ভাবত, যে বন্ধুর জন্য আমি এই রাজকন্যাকে লাভ করলাম সেই বন্ধু আমাকে স্বার্থপর ভাবছে। তার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে পারছি না।

একদিন রাজকন্যা রাজপুত্রকে তার এই দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজপুত্র তাকে তার বন্ধুর কথা সব বলল।

রাজকন্যা বলল, তুমি এখনি গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এস। আমি কিছু ভাল মিষ্টি তৈরি করে আমার সখীকে দিয়ে তা পাঠাচ্ছি তোমার বন্ধুর জন্য।

রাজপুত্র চলে গেলে রাজকন্যা ভাবল, এই রাজপুত্রের নিজস্ব কোন বুদ্ধি নেই, তার বন্ধুর বুদ্ধিতেই সে আমাকে পেয়েছে। এই বন্ধুর কথাতে সে আমাকে ত্যাগ করতেও পারে যে কোন সময়ে। সুতরাং তার বন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না।

এই ভেবে সে সেই সব মিষ্টির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তার সখীকে দিয়ে সেই বুড়ীর কুঁড়েতে পাঠিয়ে দিল।

এদিকে রাজপুত্র সেই বুড়ীর কুঁড়েঘরে গিয়ে মন্ত্রীপুত্রকে সব কথা বলল। দুই বন্ধুতে যখন কথা বলছিল তখন রাজকন্যার দেওয়া অনেক মিষ্টি নিয়ে সখী সেখানে গেল। রাজপুত্র তার বন্ধুকে বলল, আমার স্ত্রী পদ্মাবতী তোমার পরিচয় জেনে খুশি হয়েছে। সে নিজের হাতে এই সব খাবার তৈরি করে

পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য। সে-ই আমাকে পাঠিয়ে দেয় তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তুমি এগুলি খাও।

মন্ত্রীপুত্র মিষ্টি দেখে দুঃখিত হয়ে বলল, কিন্তু বন্ধু আমি ত এগুলি খেতে পারব না। এতে বিষ মেশানো আছে। তুমি রাজকন্যার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করনি। তুমি ওদের স্বভাব জান না। রাজকন্যারা তাদের স্বামীর প্রিয়পাত্রকে সহ্য করতে পারে না বলে তার জীবননাশের চেষ্টা করে।

কিন্তু রাজপুত্র একথা বিশ্বাস করতে চাইল না। সে তখন তার বন্ধুর কথা পরীক্ষা করার জন্য একটা মিষ্টি বুড়ীর একটা পোষা বিড়ালকে খেতে দিল। তা খাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল বিড়ালটা।

তা দেখে দুঃখে ভেঙে পড়ল রাজপুত্র। সে মর্মাহত হয়ে বলল, সেই পাপিষ্ঠা রাক্ষসীর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি। আমি আর তার কাছে যাব না কখনো।

মন্ত্রীপুত্র বলল, না। তাকে ত্যাগ না করে কৌশলে তাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। তুমি তার কাছে গিয়ে বল, আমি তার দেওয়া মিষ্টি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তাহলে সে ভাববে আমি মরে গেছি। তারপর রাত্রিবেলায় সে ঘুমিয়ে পড়লে তার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে একটা পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে আসবে।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের কথামত সব কাজ করে সেই রাতের মধেই ফিরে এল বুড়ীর কুটিরে।

পরদিন সকালে মন্ত্রীপুত্র শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসী সেজে রাজপুত্রকে তার শিষ্য করল। তারপর বলল এই গয়নাগুলো রাজবাড়ির কাছে এক স্যাকরার দোকানে বিক্রি করবে। কেউ রাজকন্যার গয়না চিনতে পেরে তোমাকে ধরলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। বলবে আমার গুরু বলেছে।

রাজপুত্র সেই গয়নাগুলো রাজবাড়ির কাছে এক স্যাকরার দোকনে বিক্রি করতে গেলে স্যাকরা গয়নাগুলো চিনতে পারল। সে দেখল এই গয়নাগুলো কিছুকাল আগে সে রাজকন্যার জন্য তৈরি করেছে।

স্বর্ণকার তখন রাজপুত্রকে বলল, এ সব গয়না রাজকন্যার। তুমি কোথায় কি করে পেলে ?

ক্রমে দোকানের সামনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। নগর রক্ষক

খবর পেয়ে এসে রাজপুত্রকে জেরা করতে লাগল। রাজপুত্র বলল, আমি কিছুই জানি না। আমার গুরু শ্মশানে থাকেন। তিনিই এগুলো আমায় বেচতে পাঠিয়েছেন।

তখন নগররক্ষক রাজপুত্রকে নিয়ে শ্মশানে এসে গুরু ও শিষ্যকে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা সব কিছু শুনে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী মন্ত্রীপুত্রকে নির্জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব গয়না তুমি কোথায় পেলে ?

সন্ন্যাসীরূপী মন্ত্রীপুত্র বলল, কৃষ্ণচতুর্দশীর রাতে আমি শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করছিলাম। মন্ত্রের প্রভাবে এক ডাকিনী এসে তার গা থেকে সব গয়না খুলে দিয়ে যায়। আমার যোগসিদ্ধির প্রমাণ হিসাবে তার বাঁ পায়ে ত্রিশূলচিহ্ন এঁকে দিয়েছি। এই সেই গয়না।

রাজা তখন অন্দরমহলে গিয়ে রাণীকে বললেন, দেখ ত পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে কোন চিহ্ন আছে কি না।

রাণী মেয়েকে দেখে এসে বলল, তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

তা শুনে রাজা রেগে গিয়ে বললেন, এই রকম পাপিষ্ঠা মেয়েকে রাজবাড়িতে রাখা উচিত নয়। একে প্রাণদণ্ড না নির্বাসন কি শাস্তি দেব তা ভেবে পাচ্ছি না।

সন্ন্যাসীরূপী মন্ত্রীপুত্র বলল, নারী ও বালকদের প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত না। আপনি ওকে নির্বাসনদণ্ড দিন।

রাজা তখন বললেন পদ্মাবতীকে আমি নির্বাসনদণ্ড দিলাম। ওকে আমার রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাও। ও থাকলে আমার রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

রাজার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীকে পাল্কিতে করে নগর বাইরে এক গভীর বনে রেখে এল।

এদিকে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র পদ্মাবতীর খোঁজে সেই বনে চলে গেল। তারা গিয়ে দেখল পদ্মাবতী একটি গাছের তলায় একা বসে বসে ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় কাঁদছে। রাজপুত্র তখন তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে দেশের পথে রওনা হলো।

অনেকদিন পর ছেলে ও পুত্রবধূকে দেখে আনন্দিত হলেন রাজা প্রতাপমুকুট।

কাহিনী শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, এবার বল

মহারাজ! পদ্মাবতী, তার বাবা রাজা দন্তকাট আর মন্ত্রীপুত্র— এই তিনজনের মধ্যে কার অপরাধ সবচেয়ে বেশী?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা দন্তকাটের।

বেতাল বলল, কেন?

রাজা বললেন, পদ্মাবতী শত্রু ভেবে মন্ত্রীপুত্রের নাশ করতে চেয়েছে। শত্রুবধে পাপ হয় না। মন্ত্রীপুত্র পদ্মাবতীকে শত্রু ভেবে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তার সঙ্গে। তাতে কোন দোষ হয়নি। কিন্তু রাজা দন্তকাট উপযুক্ত বিচার না করে প্রমাণ না নিয়ে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে স্নেহ ভুলে মেয়েকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। রাজা বিক্রমাদিত্য আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে রওনা হলেন।

বেতাল তখন দ্বিতীয় কাহিনী বলতে শুরু করল।

দ্বিতীয় কাহিনী

পুরাকালে যমুনানদীর তীরে জয়স্থল নামে এক গ্রামে কেশববর্মা নামে এক মেয়েটির ব্রাহ্মণ বাস করত। এই ব্রাহ্মণের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। নাম ছিল মধুমালতী। সে ছিল পরমাসুন্দরী। ক্রমে মেয়েটির বিয়ের বয়স হলে ব্রাহ্মণ ও তার ছেলে চারদিকে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করতে লাগল।

একদিন ব্রাহ্মণ কোন এক বিয়ে উপলক্ষে অন্য কোন এক গ্রামে যায়। তার ছেলে তখন গুরুর বাড়িতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। এমন সময় ত্রিবিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করে। বাড়িতে তখন ছিল মধুমালতী আর তার মা।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী দেখল ছেলেটি দেখতে সুন্দর, শিক্ষিত এবং তার ব্যবহারও ভাল। তার বংশও ভাল।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী ভাবল, ছেলেটি সব দিক দিয়ে উপযুক্ত পাত্র। তার সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হলে ভাল হয়। এই ভেবে বলল, তোমার ইচ্ছা থাকলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দেব।

মধুমালতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ত্রিবিক্রমও এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তখন তারা ব্রাহ্মণের বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল।

কিছুদিন পর কেশববর্মা ও তার ছেলে দুটি পাত্র সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাদের নাম বামন ও মধুসূদন।

এইভাবে মধুমালতীর বিয়ের জন্য তিনটি পাত্র যোগাড় হলো। তারা তিনজনই রূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ও বংশমর্যাদায় সমান।

কেশববর্মা তখন মহা সমস্যায় পড়ল। তিনটি পাত্রের মধ্যে কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে এই নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

এমন সময় তার স্ত্রী এসে খবর দিল, মধুমালতীকে সাপে কামড়েছে।

তা শুনে কেশববর্মা ও তার ছেলে পাঁচ জন বিষবৈদ্য নিয়ে এল। কিন্তু মধুমালতীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। বিষবৈদ্যরা ব্যর্থ হয়ে চলে গেল। মধুমালতী বিষক্রিয়ায় মারা গেল। সকলে শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

কেশব, তার ছেলে ও সেই তিনটি পাত্র সকলে মিলে মধুমালতীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে দাহ করে এল।

এদিকে তিনটি পাত্রই মধুমালতীকে ভালবেসেছিল। তারা কেউ মধু-মালতীকে ভুলতে পারল না। ত্রিবিক্রম নিবে যাওয়া চিতা থেকে হাড়গুলো কাপড়ে বেঁধে তার বাড়ি গিয়ে ঘরের কোণে রেখে দিয়ে দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগল। বামনও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগল। মধুসূদন সেই শ্মশানের একধারে এক পাতার কুঁড়ে তৈরি করে মধুমালতীর চিতা থেকে ছাইগুলো জড়ো করে ঘরের এককোণে রেখে যোগসাধন করতে লাগল।

এদিকে বামন ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরে এক গাঁয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উঠল। খাওয়ার সময় সন্ন্যাসীকে দেখে ব্রাহ্মণ তাকে যত্ন করে খেতে দিল। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের একটি ছেলে তার মাকে জ্বালাতন করতে লাগল। ব্রাহ্মণী তাকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই শান্ত হলো না। সে কান্নাকাটি করে সমানে জ্বালাতন করে যেতে লাগল তার মাকে।

তখন ব্রাহ্মণী রাগ সামলাতে না পেরে ছেলেটিকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে নির্বিকারভাবে খাবার পরিবেশন করতে লাগল।

ব্রাহ্মণীর এই নিষ্ঠুর কাজ দেখে সন্ন্যাসীরূপী বামন ভাতের থালা ফেলে উঠে পড়ল।

তা দেখে ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে বলল, একি, উঠে পড়লেন কেন ?

বামন বলল, যে ঘরে এমন রাক্ষসীর মত মা আছে সে ঘরে কি করে অন্নগ্রহণ করি বলুন।

ব্রাহ্মণ তখন হেসে একটি পুঁথি নিয়ে এসে সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে পোড়া মৃত ছেলেটি আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে তার মাকে তেমনি জ্বালাতন করতে লাগল।

বামন বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার খাওয়া শেষ করল। সে ভাবতে লাগল, এই পুঁথিতে যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে তা জানতে পারলে তার সাহায্যে মধু-মালতীকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। এ পুঁথিটিকে যেমন করে হোক চুরি করে নিয়ে যেতে হবে।

মনে মনে সংকল্প করে ব্রাহ্মণকে বলল, দিন শেষ হয়ে আসছে। রাত্রিবেলায় কোথায় যাব ? সুতরাং রাতটা আজ এখানেই থাকব।

ব্রাহ্মণ তার থাকার জায়গা করে দিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। বামন তখন সুযোগ বুঝে পাশের ঘর থেকে সেই পুঁথিটি বার করে এনে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বামন এবার সোজা জয়স্থল গ্রামের সেই শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে তখন মধুসূদন সেই পাতার কুঁড়েতে থেকে যোগসাধনা করছিল। এমন সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

বামন তখন তাদের বলল, আমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখেছি। তোমরা যে সব হাড় ও ছাই রেখে দিয়েছ তা নিয়ে এসে এক জায়গাতে জড়ো করো। আমি মধুমালতীকে আবার বাঁচিয়ে তুলব।

ত্রিবিক্রম ও মধুসূদন ব্যস্ত হয়ে হাড় ও ছাই নিয়ে এল। বামন তখন সেই পুঁথি খুলে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই হাড় ও ছাই থেকে মধুমালতীর সুন্দর দেহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

তখন তারা তিনজনেই মধুমালতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে মধুমালতীকে বিয়ে করার জন্য ঝগড়া করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

বেতাল এবার তার কাহিনী শেষ করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, বলত মহারাজ, মধুমালতীর সঙ্গে কোন পাত্রের বিয়ে হওয়া উচিত ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, যে মধুসূদন শ্মশানে পাতার কুটির তৈরি করে বাস করে তার সঙ্গেই মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত।

বেতাল বলল, ত্রিবিক্রম যদি হাড় সংগ্রহ না করত আর বান যদি মৃত

সঞ্জীবনী মন্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করতে না পারত তাহলে কি করে মধুমালতীর প্রাণ ফিরে পেত ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ত্রিবিক্রম অস্থি বা হাড় সংগ্রহ করে ছেলের কাজ করেছে। বামন তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে বাবার কাজ করেছে। একমাত্র মধুসূদনই ছাই সংগ্রহ করে পাতার কুঁড়ে বেঁধে এতকাল অপেক্ষা করে প্রেমিক স্বামীর মত কাজ করেছে। সুতরাং তারই সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। বিক্রমাদিত্য তার পিছু পিছু গিয়ে গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার তৃতীয় কাহিনী বলতে শুরু করল।

তৃতীয় কাহিনী

সেকালে বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনি ধার্মিক ও দয়ালু।

একদিন বীরবর নামে দক্ষিণদেশীয় এক যোদ্ধা এসে রাজা রূপসেনের কাছে কাজ চাইল।

বীরবরের বীরোচিত চেহারা ও ভাল ব্যবহার দেখে রাজা তাকে বললেন, তুমি কত টাকা বেতন চাও ?

বীরবর বলল, রোজ একহাজার মোহর বা সোনার টাকা পেলেই আমার চলে যাবে।

রাজা বললেন, তোমাদের পরিবারে কত জন লোক আছে ?

বীরবর বলল, আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই।

রাজা তখন ভাবতে লাগলেন, এর সংসার ছোট হলেও যখন এত টাকা বেতন চাইছে তখন নিশ্চয়ই এর কোন অসাধারণ গুণ আছে। অতএব একে চাকরি দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

এই ভেবে রাজা বীরবরকে নৈশ প্রহরী নিযুক্ত করে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, একে প্রতিদিন এক হাজার সোনার মোহর বেতন হিসাবে দেবে।

বীরবর প্রতিদিন এক হাজার সোনার টাকা নিয়ে তার বাসায় এসে অর্ধেক টাকা সন্ন্যাসী ও সাধু তপস্বীদের দান করত। বাকি টাকায় গরীব দুঃখী ও অনাথদের পেট ভরে খাইয়ে সংসারের ব্যয়ভার চালাত।

সারাদিন এইভাবে দানধ্যান করে রাত্রিতে রাজবাড়ি পাহারা দিত বীরবর। তার শক্তি ও সাহস পরীক্ষা করার জন্য রাজা মাঝে মাঝে কঠিন কাজ করতে পাঠাতেন তাকে। সে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ফিরে আসত বীরবর।

একদিন গভীর রাতে নারীকণ্ঠের এক কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন রাজা। তিনি বীরবরকে ডেকে বললেন, দক্ষিণদিক থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শোনা যাচ্ছে। তুমি, এখনি গিয়ে এর কারণ জেনে এসে আমাকে জানাও।

'যথা আজ্ঞা' বলে তখনি চলে গেল বীরবর। বীরবরের সাহস ও শক্তি দেখার জন্য রাজাও গোপনে তার পিছু পিছু গেলেন।

দক্ষিণ দিকে কান্না লক্ষ্য করে নগরের বাইরে শ্মশানে গিয়ে বীরবর দেখল পরমাসুন্দরী এক নারী দামী কাপড় ও গয়না পরে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদছে।

বীরবর তা দেখে আশ্চর্য হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, কে আপনি মা? কেনই বা একা শ্মশানে বসে কাঁদছেন?

নারী কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

বীরবর বারবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করল সেই নারীকে।

অবশেষে নারী বলল, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজবাড়িতে ছিলাম। কিন্তু রাজার প্রাসাদে নানা অন্যায় কাজ হচ্ছে বলে আমি আর থাকতে পারছি না সেখানে। আমি চলে গেলেই অলক্ষ্মী আসবে এবং রাজার অমঙ্গল হবে। রাজার মৃত্যু হবে। তাই আমি কাঁদছি।

বীরবর তখন বলল, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

রাজলক্ষ্মী বললেন, সে বড় কঠিন কাজ। এখান থেকে আধ যোজন দূরে একটি মন্দিরে এক দেবী আছেন। কেউ যদি তার নিজের ছেলেকে সেই দেবীর সামনে বলি দিতে পারে তাহলে তাঁর দয়ায় রাজার সব বিপদ কেটে যাবে।

বীরবর তখন তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে জাগিয়ে সব কথা বলল।

ছেলে বীরবরকে বলল, এতো সৌভাগ্যের কথা বাবা। প্রথমতঃ তোমার

আদেশমত কাজ করছি। তার উপর তোমার কর্তব্যপালনে সাহায্য করছি আর আমার এই নশ্বর দেহ দেবতাকে নিবেদন করছি।

এরপর সকলে পূজার উপচার নিয়ে সেই মন্দিরে চলে গেল। রাজাও তাদের রাজভক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে তাদের পিছু পিছু গোপনে সেই দেবীর মন্দিরে গেলেন।

মন্দিরে গিয়ে পূজা শেষ করে বীরবর হাতজোড় করে বলল, হে দেবী, তামাকে তুষ্ট করার জন্য আমি আমার পুত্রকে বলি দিচ্ছি। এতে যেন রাজার আয়ু ও রাজ্য শক্তিশালী হয়।

এই বলে খড়্গ তুলে ছেলের মাথা কেটে দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিল ীরবর।

বীরবরের স্ত্রী ও তার মেয়ে দুঃখে সেই খড়্গ দিয়ে আত্মহত্যা করল। ারবর তখন ভাবল স্ত্রী ও পুত্রকন্যা হারিয়ে সংসারে থাকা বা জীবনধারণ রার কোন অর্থ হয় না।

এই ভেবে সেও খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

এই দৃশ্য দেখে দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে গেল রাজার হৃদয়। তিনি তখন ন মনে বলতে লাগলেন, যে রাজ্যে একজন প্রভুভক্ত সেবকের প্রাণ গেল । রাজ্য আমি আর ভোগ করতে চাই না। এ প্রাণও আর আমি রাখতে ই না।

রাজা এবার খড়্গ তুলে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী । স্বশরীরে আর্বিভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন, থাম তোমার সাহস ও মতায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি বর দিতে চাও ত এই মৃত চারজনকে প্রাণ ন করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে স্বর্গ হতে অমৃত এনে মৃত চারজনের গায়ে ছিটিয়ে য় তাদের বাঁচিয়ে দিলেন। তারা যেন সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠে ল।

বীরবর ও তার স্ত্রী পুত্রদের বেঁচে উঠতে দেখে রাজা আনন্দিত হয়ে ীর স্তব করতে লাগলেন ভক্তিভরে। রাজার ভক্তি দেখে দেবী খুশি হয়ে শীর্বাদ করে অন্তর্ধান করলেন।

পরদিন সকালে রাজসভায় সভাসদদের সামনে গতরাতের ঘটনার কথা বললেন। তারপর প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল রাজা! এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী মহৎ ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজাই বেশী মহৎ।

বেতাল বলল, কেন ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, বীরবর প্রাণ দিয়ে তার প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালন করেছিল। আর তার স্ত্রীও স্বামীর জন্য এবং ছেলেমেয়েরা তাদের পিতার জন্য প্রাণ বলি দিয়েছিল। এরা সবাই আপন আপন কর্তব্য ও ধর্ম পালন করেছিল। কিন্তু রাজা তাঁর সেবকের জন্য প্রাণবলি দিতে চেয়েছিলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে রইল। রাজা আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করলেন।

এদিকে বেতালও তার চতুর্থ গল্প শুরু করল।

চতুর্থ কাহিনী

সেকালে ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার চূড়ামণি নামে এক শুক পাখি ছিল। পাখিটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা সব জানত।

রাজা একদিন চূড়ামণিকে বললেন, তুমি যদি তিনকালের কথা জান ত বল আমার মনের মত মেয়ে কোথায় আছে যাকে আমি বিয়ে করতে পারি।

চূড়ামণি বলল, মহারাজ, মগধের রাজা বীরসেনের সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।

রাজা তখন রাজদৈবজ্ঞ চন্দ্রকান্তকে ডেকে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন।

চন্দ্রকান্তও গণনা করে একই কথা বলল। রাজা তখন সন্তুষ্ট হয়ে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে মগধে দূত হিসাবে পাঠালেন।

মগধের রাজকন্যা চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে এক শারি পাখি ছিল। সেও ছিল সর্বজ্ঞ।

একদিন চন্দ্রাবতী শারিকে বলল, শারি, তুমি যদি তিনকালের কথা জান ত বল; আমার যোগ্য বর কোথায় আছে।

শারি বলল, ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনই তোমার স্বামী হবেন।

অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী দুজনেই পাখির কাছ থেকে তাদের বিয়ের কথা জানতে পেরে পরস্পরকে ভালবাসতে লাগল মনে মনে।

কিছুদিনের মধ্যেই অনঙ্গসেনের দূত এল মগধরাজের কাছে। অনঙ্গসেনের বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হলেন মগধরাজ। দূতের সঙ্গে ব্রাহ্মণকে পাঠালেন বিয়ের দিনস্থির করার জন্য।

নির্ধারিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এসে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন। চন্দ্রাবতী তার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় তার প্রিয় শারিকা পাখিটিকে সঙ্গে করে আনে।

একদিন রাজা অনঙ্গসেন তাঁর রাণী চন্দ্রাবতীকে বললেন, আমরা বিয়ে করে সুখী হয়েছি। আমার ইচ্ছা আমাদের দুজনের প্রিয় শুক-শারি স্বামী-স্ত্রীর মত এক খাঁচায় থাক। ওরাও আমাদের মত সুখী হোক।

চন্দ্রাবতীও তাতে রাজী হলে সেদিন থেকে এক খাঁচায় রাখা হলো শুক-শারিকে।

কিন্তু শারি তাদের এই মিলনে খুশি হতে পারল না। সে প্রায়ই চুপচাপ মুখভার করে বসে থাকত। একদিন শুক তাকে বলল, সংসারে ভোগই সারবস্তু। কিন্তু ভোগে তোমার উৎসাহ নেই কেন?

শারি বলল, পুরুষসঙ্গ আমার মোটেই ভাল লাগে না। কারণ পুরুষ-জাতি বড়ই স্বার্থপর। তারা শঠ, প্রবঞ্চক, অধার্মিক এবং হত্যাকারী।

শুকও রেগে গিয়ে বলল, মেয়েরাও কম স্বার্থপর নয়। তাদের কথা আর বলো না। মেয়েরা চপলমতি, কুটিলা, ছলনাময়ী, লোভী এবং স্বামীঘাতিনী।

শুক-শারির এই তর্ক বিতর্ক দেখে রাজা বললেন, তোমরা বৃথা তর্ক করে তিক্ততার সৃষ্টি করছ কেন?

শারি বলল, মহারাজ, বৃথা তর্ক করছি না বা মিথ্যা কথা বলছি না। পুরুষরা যে কত স্বার্থপর ও অধার্মিক তা আমার জানা আছে। এক সত্য কাহিনী বলছি শুনুন।

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনী বণিক বাস করত। বিয়ের পর বহুদিন গত হলেও কোন সন্তান না হওয়ায় সে দুঃখিত হয়ে ওঠে। অবশেষে বেশী বয়সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তার স্ত্রী। আনন্দের সীমা রইল না বণিকের। সে তার ছেলের নাম রাখল নয়নানন্দ। পরম যত্নে তাকে পালন

করতে লাগল বণিক ও তার স্ত্রী। তার বয়স পাঁচ হলে তার পড়াশুনোর জন্য এক শিক্ষক নিযুক্ত করল।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বড় দুষ্ট প্রকৃতির ছিল নয়নানন্দ। লেখাপড়ায় মোটেই মন বসত না তার। সে যত সব দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা নিয়ে থাকত। তার কুবুদ্ধির অন্ত ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দোষ-গুলোও বেড়ে চলতে থাকে।

এমন সময় বণিকের মৃত্যু হওয়ায় অল্প বয়সেই অতুল ঐশ্বর্য ও ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো নয়নানন্দ। উপার্জনের কোন চিন্তা না করে দুহাতে টাকা খরচ করে যেতে লাগল। এইভাবে বাজে খরচ করতে করতে সব টাকা খরচ হয়ে গেল। সব বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ল সে।

মহা দুর্দশার মধ্যে পড়ল নয়নানন্দ। বাড়ি ছেড়ে পথে ঘুরতে লাগল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রপুরে তার বাবার এক বন্ধু হেমগুপ্তের বাড়িতে গিয়ে উঠল সে। সে তার পরিচয় দিলে বন্ধুপুত্র হিসাবে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল হেমগুপ্ত।

তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা কথা বলল নয়নানন্দ। সে বলল, কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলাম। সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজগুলো সব ডুবে যায়। কোনরকমে বেঁচে যাই। একটা কাঠ ধরে ঢেউ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তীরে এসে পড়ি।

তার দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে সে কপটতার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল ফেলল চোখ থেকে।

হেমগুপ্ত কিন্তু সরলভাবে নয়নানন্দের সব কথা বিশ্বাস করল। পরম যত্নে তার বাড়িতে থাকতে বলল।

হেমগুপ্তের রত্নাবতী নামে একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল। অনেক খুঁজেও মনের মত পাত্র পাচ্ছিল না মেয়ের জন্য। তাই নয়নানন্দকে পেয়ে খুশি হলো হেমগুপ্ত। ভাবল ঈশ্বরের কৃপায় সৎপাত্র তার ঘরে নিজে থেকেই হাজির হয়েছে। নয়নানন্দ সদ্বংশজাত এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। সুতরাং তার সঙ্গেই তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত।

স্ত্রীকে কথাটা বলতে স্ত্রীও রাজী হয়ে গেল। বিয়ের প্রস্তাবে নয়নানন্দও রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

শুভ দিনে নয়নানন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রত্নাবতীর। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেল নয়নানন্দ। সুখে দিন কাটতে লাগল তার।

কিন্তু একঘেয়ে জীবনযাত্রা ভাল লাগছিল না নয়নানন্দের। আগেকার উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের দিনগুলির কথা মনে পড়তে লাগল তার। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে তার পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মনে মনে।

একদিন রত্নাবতীকে বলল সে, এখন আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। অনেকদিন এসেছি বাড়ি থেকে। তুমি বাবা মাকে বলে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করো।

মেয়ে জামাই-এর কথা শুনে আনন্দিত হলো হেমগুপ্ত। জামাই-এর চিরদিন শ্বশুরবাড়িতে বাস করা ঠিক না, তাই হেমগুপ্ত এক শুভ দিনে সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিল। পালকিতে করে যাত্রা করল মেয়ে জামাই।

এদিকে নয়নানন্দের মনে এক কু-অভিসন্ধি দানা বেঁধে উঠেছিল। পথে এক বন পড়লে সে তার স্ত্রীকে বলল, এই বনে দস্যু আছে। পালকিতে করে গেলে তারা আমাদের ধনী ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর। আমরা বরং পালকি ছেড়ে দিয়ে লোকজনদের সব বিদায় দিয়ে হেঁটে যাব। তুমি তোমার গা থেকে সব গয়না খুলে একটা পুঁটলিতে বাঁধ। সঙ্গে টাকাকড়ি যা আছে পুঁটলিতে রেখে দাও। শহরে ঢুকে আবার সব গয়না পরবে।

সরল প্রকৃতির রত্নাবতী কিছু বুঝতে না পেরে সব কিছু পুঁটলিতে বেঁধে সেটা তার স্বামীর হাতে দিয়ে দিল।

পালকি ও লোকজনকে বিদায় দিয়ে গভীর বনের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলতে লাগল দুজনে। যেতে যেতে পথের ধারে একটি কূয়ো দেখে রত্নাবতীকে তার মধ্যে জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে গয়না ও টাকাকড়ির পুঁটলিটা নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল নয়নানন্দ।

রত্নাবতী সেই কূয়োর মধ্যে পড়ে তার বাবা মায়ের নাম করে জোরে চিৎকার করতে লাগল।

এমন সময় একটি লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে নারীকণ্ঠের কাতর চিৎকার শুনে কূয়োর পাশে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটি সুন্দরী মেয়ে উদ্ধারের জন্য আকুলভাবে কাঁদছে।

লোকটি অনেক কষ্টে রত্নাবতীকে উপরে তুলে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। বলল, কে তুমি? কেন এই বনের মধ্যে একা এলে?

রত্নাবতী দেখল সত্য কথা বললে স্বামীর নিন্দা করা হয়। তাই সে প্রকৃত কারণ গোপন করে বলল, আমার নাম রত্নাবতী। চন্দ্রপুরের বণিক হেমগুপ্ত আমার বাবা। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম। এই বনের মধ্যে পথ চলার সময় দস্যুরা আমার সব গয়না কেড়ে নিয়ে কূয়োর মধ্যে ফেলে দেয় আমাকে। স্বামীকেও মেরে তাড়িয়ে দেয়।

সব কথা শুনে দয়া হলো লোকটির। সে যত্ন করে রত্নাবতীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা মার কাছে পৌঁছে দিল।

বাড়িতেও প্রকৃত ঘটনা গোপন করল রত্নাবতী। যাই হোক, বাবা মা মেয়েকে পেয়ে খুশি হলো। কিন্তু জামাইএর ভাগ্যে কি ঘটল তার জন্য দুঃখিত হলো। হেমগুপ্ত মেয়ের জন্য আবার সব গয়না গড়িয়ে দিল।

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে স্ত্রীর সব গয়না বেচে মদ খেয়ে ও জুয়া খেলে সব টাকা অল্প দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলল। আবার দুরবস্থার মধ্যে পড়ল। সে তাই ঠিক করল, আবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসবে। সে ভাবল, রত্নাবতী হয়ত কূয়োতেই মারা গেছে। তার কুকর্মের কথা কেউ জানে না সেখানে।

কিন্তু একদিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই রত্নাবতীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল সে। এই সংকট হতে কিভাবে উদ্ধার করবে নিজেকে তা ভাবতে লাগল।

কিন্তু রত্নাবতী সত্যি সত্যিই বড় পতিব্রতা মেয়ে ছিল। সে স্বামীকে দেখে খুশি হলো এবং ভাবতে লাগল, স্বামী যত মন্দই হোক, সে তার পরম গুরু। স্বামীর নিন্দা করা পাপ। ভুলক্রমে যে পাপ সে করেছে তার জন্য এখন তাকে অনাদর করলে পাপ হবে। তাছাড়া এত অন্যায় করেও সে তারই জন্য তাদের বাড়িতে এসেছে।

এইসব ভেবে রত্নাবতী স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবো না। আমি বাড়িতে কাউকে প্রকৃত ঘটনার কথা বলিনি। সবাইকে বলেছি, বনপথে দস্যুরা আমার সব গয়না নিয়ে আমাকে কূয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার জন্য বাবা মা চিন্তায় ছিলেন। তোমাকে দেখে খুশি হবেন তাঁরা। তুমি যেন আমাকে আবার ফেলে পালিয়ে যেও না।

স্ত্রীর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলো নয়নানন্দ। এতদিন পর জামাইকে দেখে শ্বশুর শাশুড়ীও আনন্দিত হলো।

রাত্রিতে রত্নাবতী ভাল কাপড় ও গয়না পরে শুতে গেল স্বামীর কাছে।

শোবার ঘরে ঢুকে সে দেখল তার স্বামী ঘুমোচ্ছে। সে ভাবল পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে নয়নানন্দ কিন্তু আসলে ঘুমোয়নি। ঘুমোবার ভান করে তার কুমতলব চরিতার্থ করার কথা ভাবছিল। সে তাই যখন দেখল রত্নাবতী গভীর-ভাবে ঘুমোচ্ছে, তখন সে এক তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করে তার সব গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে শারি বলল, মহারাজ, এই ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেই থেকে পুরুষজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মেছে আমার মনে। পুরুষরা কত বড় স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর, তার পরিচয় পেয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কোন পুরুষের সংস্পর্শে আমি থাকব না।

রাজা এবার তাঁর প্রিয় শুক চূড়ামণিকে বলল, এবার তুমি বল, কেন তুমি স্ত্রীজাতির উপর এত বিরক্ত।

তখন শুক তার কাহিনী শুরু করল।

কাঞ্চনপুরে সাগরদত্ত নামে এক বণিক ছিল। তার ছেলে শ্রীদত্ত ছিল রূপে গুণে সমান। তার স্বভাব ছিল খুবই অমায়িক। সকলেই তার প্রশংসা করত।

শ্রীদত্ত বড় হলে অনঙ্গপুরের বণিক সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর শ্রীদত্তকে বাণিজ্য করতে বিদেশে যেতে হয়। জয়শ্রী তখন তার বাপের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকে।

কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে থাকতে মন চাইল না জয়শ্রীর। প্রায়ই সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখত। সব সময় চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে থাকত তার মন। একদিন সে রূপবান ও সুন্দর বেশভূষা পরা এক যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। যুবকও তাকে দেখল। তার ফলে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল জয়শ্রীর মন।

জয়শ্রী তার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে ডেকে বলল, সখী, যেমন করে পার ঐ যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও।

সখী সেইদিন সেই যুবকের কাছে গিয়ে বলল, মহাশয়, সোমদত্ত বণিকের কন্যা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আজ সন্ধ্যায় আপনি আমার বাড়িতে আসুন। সেখানেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

যুবক খুশী হয়ে তাতে রাজী হলো।

সখী জয়শ্রীর কাছে গিয়ে একথা বললে জয়শ্রী খুশি হয়ে তাকে একটা উপহার দিল।

সন্ধ্যার পর যুবক সখীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সখী জয়শ্রীকে খবর দিলে জয়শ্রী বলল, তাকে বসতে বল। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি যাব।

এইভাবে সখীর বাড়িতে রোজ রাতে গিয়ে যুবকের সঙ্গে মিলিত হত জয়শ্রী।

কিছুদিন পর জয়শ্রীর স্বামী শ্রীদত্ত বাণিজ্য করে দেশে ফিরে এল। জয়শ্রীর বাবা মা অনেকদিন পর জামাইকে দেখে খুশি হলো। কিন্তু স্বামীকে দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না জয়শ্রী। সে সেই যুবককে ভুলতে পারল না।

রাত্রিতে শোবার ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বিদেশ থেকে আনা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দিল শ্রীদত্ত। কিন্তু জয়শ্রী মুখভার করে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন শ্রীদত্ত ক্ষুণ্ণ মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বামী গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে সখীর ঘরে গিয়ে সেই যুবকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বেরিয়ে পড়ল জয়শ্রী। সে যখন অন্ধকারে একা দামী কাপড় গয়না পরে সখীর বাড়িতে যাচ্ছিল তখন এক চোর তাকে দেখে তার পিছু নিল।

এদিকে সেই যুবকটি সখীর বাড়ির কাছে একটি শিরীষ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে জয়শ্রীর জন্য যখন অপেক্ষা করছিল তখন অতর্কিতে এক বিষধর সাপের কামড়ে সে মারা যায়। তার মৃতদেহটি সেখানেই পড়ে ছিল।

জয়শ্রী সেখানে গিয়ে ভাবল যুবকটি ঘুমিয়ে পড়েছে। সে অনেক ডাকা-ডাকি করল। কিন্তু যুবক কোন সাড়া না দেওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়ল জয়শ্রী। অদূরে দাঁড়িয়ে চোর সব দেখল।

সেই শিরীষ গাছে এক পিশাচ থাকত। সে সব কিছু দেখে জয়শ্রীর মত এক দুশ্চরিত্রা মেয়েকে শিক্ষা দেবার জন্য গাছ থেকে নেমে এসে যুবকটির মৃতদেহটির মধ্যে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেল মৃতদেহটি লাফ দিয়ে উঠে জয়শ্রীর নাকের ডগাটা কামড়ে কেটে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। পিশাচ আবার গাছে উঠে পড়ল।

এবার জয়শ্রী বুঝতে পারল যুবকটি মারা গেছে। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে সখীর কাছে গিয়ে একথা বলল। সে বলল, তবু সে তার স্বামীকে মেনে নিতে পারবে না।

অবশেষে জয়শ্রী তার সখীকে বলল, স্বামীকে তাড়াবার একটা মতলব এঁটেছি আমি।

জয়শ্রী এবার বাড়ি ফিরে তার শোবার ঘরে চলে গেল। তার স্বামী তখনো ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ জয়শ্রী কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠল। বলতে লাগল, বাঁচাও, মেরে ফেলল আমাকে।

তার নাকের ডগার ক্ষত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। বাড়ির সব লোক তার চিৎকারে ছুটে এলে জয়শ্রী তার স্বামীকে দেখিয়ে বলল, ঐ খুনে লোকটা আমার নাক কেটে দিয়েছে, আমাকে মেরেছে।

গোলমালে তার স্বামী শ্রীদত্তরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। উঠে কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ জয়শ্রীর কথা সকলেই বিশ্বাস করে তার স্বামীকেই দোষ দিতে লাগল একবাক্যে।

জয়শ্রীর বাবার অভিযোগে নগরকোটাল এসে ধরে নিয়ে গেল শ্রীদত্তকে।

শ্রীদত্ত এতক্ষণে বুঝতে পারল তার স্ত্রী নিশ্চয়ই চরিত্রহীনা। সে তাকে নিয়ে ঘর করতে চায় না। তাই তাকে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চায়। তাই সে ফিরে এলে কথা বলেনি তার সঙ্গে।

বিচারক বাদী বিবাদীর কথা শুনে জয়শ্রীর কথাই বিশ্বাস করলেন এবং শ্রীদত্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শূলে চড়াতে আদেশ দিলেন।

সেই চোরটি কিন্তু অদূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করে আসছিল। বিনা অপরাধে শ্রীদত্তের শাস্তি হচ্ছে দেখে তার দয়া হলো। সে বিচারকের সামনে গিয়ে বলল, হুজুর, আপনি প্রকৃত ঘটনা না জেনেই বিনা অপরাধে আসামীকে দণ্ড দিলেন। আমি এই পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণী নারীর সব কাজ নিজের চোখে দেখেছি।

বিচারক তখন বিস্মিত হয়ে চোরের মুখ থেকে সব কথা শুনে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি চোরের কথামত সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য সখীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা শিরীষ গাছের তলায় সেই যুবকের মৃতদেহটিকেও দেখতে পেলেন। এবার জয়শ্রীর নাকের ডগা কাটা সম্বন্ধে চোরের কথা বিশ্বাস করলেন বিচারক। তিনি জয়শ্রীর মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার উল্টোদিকে বসিয়ে শহরময় ঘোরাতে আদেশ দিলেন। শ্রীদত্তকে পুরস্কারদানে সন্তুষ্ট করলেন সেই সঙ্গে।

কাহিনী শেষ করে শুক বলল, দেখলেন মহারাজ, কেন আমি স্ত্রীজাতিকে পছন্দ বা বিশ্বাস করি না।

গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, এবার বল ত মহারাজ! কে বেশী পাপী—নয়নানন্দ না জয়শ্রী?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ।

ঠিক উত্তর পেয়ে গাছে উঠে ঝুলে রইল বেতাল। রাজা আবার তাকে ধরে এনে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার পঞ্চম কাহিনী শুরু করল।

পঞ্চম কাহিনী

প্রাচীনকালে ধারা নগরে মহাবল নামে এক রাজা ছিলেন। হরিদাস নামে এক ব্যক্তি এই রাজার অধীনে দূতের কাজ করত।

হরিদাসের মহাদেবী নামে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটি ক্রমে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে তার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করতে লাগল হরিদাস। এবিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করতে লাগল।

একদিন মহাদেবী তার বাবাকে বলল, বাবা, আমাকে এমন এক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবে যে সকল গুণে ভূষিত।

হরিদাস সেইমত পাত্রের খোঁজ করতে লাগল।

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে ডেকে বললেন, শোন হরিদাস, দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে আমার এক বন্ধু আছে। অনেকদিন তার কোন খবর পাইনি। তুমি সেখানে গিয়ে তার খবর এনে দাও আমাকে।

রাজার আদেশে তখনি দক্ষিণদেশের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে চলে গেল হরিদাস। রাজার সঙ্গে দেখা করে তার আসার কারণ জানাল। বন্ধুর সংবাদ পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। রাজা দূত হরিদাসকে উপযুক্ত উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করে তাঁর প্রাসাদে তাকে দুচারদিন থেকে যেতে বললেন।

একদিন রাজসভায় রাজা যখন সভাসদদের সঙ্গে বসেছিলেন তখন হরিদাসও সেখানে ছিল। রাজা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা হরিদাস, তোমার কি মনে হয় কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে?

কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে বলেই সংসারে মিথ্যা বেড়েছে এবং সত্য হ্রাস পেয়েছে মহারাজ। আজকাল মানুষের মন প্রবঞ্চনা আর কপটতায় ভরা, বসুন্ধরা অনেক কম শস্য দিচ্ছে। এযুগের মানুষ শুধু মুখে মিষ্টি কথা বলে।

রাজারা প্রজাদের কল্যাণ ও সুখ সুবিধার দিকে না তাকিয়ে শুধু প্রজাদের শোষণ করে ধনভাণ্ডার পূর্ণ করতে চায়। ব্রাহ্মণরা পুণ্যকর্ম না করে লোভী হয়ে উঠেছে। নারীরা লজ্জা ত্যাগ করে স্বৈরিণী হয়ে উঠেছে। পুত্র পিতাকে শ্রদ্ধা করে না। ভাই ভাইকে ভালবাসে না। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে সরল ও নিঃস্বার্থ ভাবে মেলামেশা করে না। সমাজের মানুষ শাস্ত্র আলোচনা বা শাস্ত্রমত কাজ করে না। সকলেই বিদ্যা ও বুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বেদকে উপেক্ষা করে চলে। ফলে পৃথিবী থেকে ধর্ম চলে গিয়ে সেখানে অধর্ম এসেছে। তাই বলি, কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে।

রাজা এই কথা শুনে হরিদাসের জ্ঞানের প্রশংসা করলেন।

সভা ভঙ্গ হলে হরিদাস তার বাসায় গিয়ে দেখল একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ যুবক তার ঘরে বসে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

হরিদাস তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে যুবক বলল, আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার আছে।

হরিদাস বলল, বল, আমার পক্ষে যদি তা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই তা দেব।

যুবক বলল, আপনার একটি পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আপনি তাকে সম্প্রদান করুন আমার হাতে।

হরিদাস বলল, আমার কন্যার ইচ্ছা সে যাকে বিয়ে করবে সে হবে সর্ব-বিদ্যায় পারদর্শী এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন।

যুবক বলল, আমি ছোটবেলা থেকে জ্ঞান অর্জন করে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছি। তাছাড়া আমার এক অসাধারণ গুণ আছে। আমি এমন এক রথ নির্মাণ করেছি যার সাহায্যে এক বছরের পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যায়।

হরিদাসকে দেখানর জন্য পরদিনই তার রথ নিয়ে এল যুবক।

রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে তখনই সেই যুবককে নিয়ে সেই রথে চড়ে দেশে রওনা হলো হরিদাস।

এদিকে বাড়ি ফিরে হরিদাস দেখল তার স্ত্রী ও পুত্র মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য দুটি পৃথক পৃথক পাত্র যোগাড় করে রেখেছে।

হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে শুনে পাত্র দুটি এসে দেখা করল তার সঙ্গে।

মহাবিপদে পড়ল হরিদাস। এক মেয়ের জন্য তিন পাত্র উপস্থিত। তিন-জনই বিদ্বান ও অসাধারণ গুণের অধিকারী।

হরিদাস তাদের বলল, আজকের রাতটা এখানেই থাক তোমরা। আমি আমার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।

কিন্তু সেই রাতেই অতর্কিতে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে মহাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে অনেক খোঁজ করেও মহাদেবীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

তখন সেই পাত্র তিনজনও এসে মহাদেবী হরণের ঘটনা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতে লাগল।

এদের মধ্যে একজন বলল, আমি যোগবলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কথা জানতে পারি। আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এক রাক্ষস মহাদেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে রেখেছে। সেখান থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তা ভেবে দেখুন।

দ্বিতীয় পাত্রটি বলল, আমিও এমন এক বিদ্যা জানি যার সাহায্যে কারো শব্দ লক্ষ্য করে তাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু সেখানে কিভাবে যাওয়া যায় সেটাই হলো সমস্যা।

হরিদাসের আনা সেই তৃতীয় পাত্রটি বলল, কোন চিন্তা নেই। আমার এমন এক রথ আছে যার সাহায্যে অল্প সময়ে শতযোজন পথ অতিক্রম করা যায়।

এই বলে তারা তিনজনে রথে চড়ে তখনি রওনা হয়ে পড়ল বিন্ধ্যাচলের পথে। সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের শব্দভেদী বাণের সাহায্যে সহজেই রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে উদ্ধার করে আনল তারা।

মহাদেবীকে বাড়িতে আনার পর তিনজন পাত্রই বিয়ে করতে চাইল তাকে। তারা বলল, আমাদের তিনজনের বিদ্যার সাহায্যে মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বেতাল এইখানেই কাহিনী শেষ করে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ ! এই তিনজনের মধ্যে মহাদেবীর যোগ্য পাত্র কে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যে ব্রাহ্মণ যুবক রাক্ষসকে তার বাণের দ্বারা বধ করে সে-ই মহাদেবীর যোগ্য পাত্র।

বেতাল বলল, কিন্তু তিনজনের বিদ্যাই ত সমান। এই তিনজনের তিন

বিদ্যার কোন একটির অভাব ঘটলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা যেত না। তাহলে শুধু দ্বিতীয় পাত্রই বা তার যোগ্য বর হবে কেন?

রাজা বললেন, তিনটি বিদ্যারই অবশ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় রাক্ষসকে বধ করতে না পারলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা যেত না।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজাও আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ হাঁটতে লাগলেন।

বেতালও তার ষষ্ঠ কাহিনী শুরু করল।

ষষ্ঠ কাহিনী

পুরাকালে ধর্মপুর নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা ছিলেন। তার অন্ধক নামে এক মন্ত্রী ছিল।

একদিন মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন, দেবী কাত্যায়নীর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করুন মহারাজ। তাহলে আপনার মঙ্গল হবে।

রাজা খুশি হয়ে মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন। মহাসমারোহে দেবীর পূজা চলতে লাগল।

তবু কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না রাজা। কারণ রাজার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় অতৃপ্ত রয়ে যায় তাঁর পুত্রকামনা।

অবশেষে একদিন মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে দেবীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, হে দেবী, ত্রিলোক-জননী, তুমি সর্ব জীবের মনের ইচ্ছা পুরণ করো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোমার আরাধনা করেন। আমি তোমার পরম ভক্ত। আমার মনের একটি-মাত্র বাসনা পূরণ করো।

ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবী আকাশবাণীতে বললেন, আমি তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়েছি। বল, কি বর চাও তুমি।

রাজা আনন্দের আবেগে বললেন, হে দেবী, কৃপা করে আমাকে এই বর দাও যেন আমি অবিলম্বে একটি পুত্রসন্তান লাভ করে সার্থক করে তুলতে পারি আমার জীবনকে।

দেবী বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি এমন একটি পুত্র লাভ করবে যে হবে শান্ত, সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী।

কালক্রমে রাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। রাজা ও রাণী নবজাত পুত্রকে নিয়ে মন্দিরে দেবী কাত্যায়নীর পূজা দিতে গেলেন।

দীনদাস নামে এক যুবক তার বন্ধুর সঙ্গে রাজধানী ধর্মপুরে বেড়াতে এসেছিল। একদিন সেই যুবক তার নিজের জাতির এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়। সে ঐ কন্যাকে বিয়ে করতে চায়।

লোকমুখে দীনদাস শুনতে পায় রাজা দেবী কাত্যায়নীর পূজা করে তাঁর কৃপায় বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। সে ভাবল সেও দেবীর কৃপা পেলে সেই কন্যাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারবে।

এই ভেবে দীনদাস দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করল, হে দেবী, যদি আমি তোমার কৃপায় ঐ কন্যাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারি তাহলে নিজের মাথা কেটে পূজা দেব।

দেবীর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে বন্ধুর কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা বলল তাকে।

বন্ধু চিন্তিত হয়ে দীনদাসের বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলল। বলল, সেই কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে না হলে সে হয়ত আত্মঘাতী হবে।

একথা শুনে দীনদাসের বাবাও ভয় পেয়ে গেল। সে তখন ধর্মপুরে গিয়ে সেই কন্যার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ছেলে দীনদাসের বিয়ের ঠিক করে ফেলল।

বিয়েতে প্রচুর যৌতুক এবং মনের মত স্ত্রী পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠল দীনদাস। দেবীর কাছে করা শপথের কথা সে ভুলে গেল।

কিছুদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ধর্মপুরে এল দীনদাস। তার বন্ধুকেও সঙ্গে নিয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরের কাছে আসতে সেই শপথের কথা মনে পড়ে গেল তার। সে ভাবতে লাগল, আমি মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ। তাই শপথের কথা ভুলে গেছি। যাই হোক, এখন আর বিলম্ব না করে এই শপথ পালন না করে দেবীকে তুষ্ট করি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে স্ত্রী ও বন্ধুকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একা মন্দিরের মধ্যে চলে গেল দীনদাস।

মন্দিরে ঢুকে দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে দীনদাস বলল, হে দেবী তোমার কাছে একদিন যে শপথ করেছিলাম তার কথা ভুলে

গিয়ে যে পাপ করেছি তার জন্য উচিত শাস্তি আমায় দাও। তবে এই মুহূর্তে আমি সে শপথ পালন করে আমার মানসিক শোধ করছি।

এই বলে মন্দিরে যে বলির খড়্গ ছিল তাই দিয়ে নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে ফেলল দীনদাস।

এদিকে দীনদাসের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তার বন্ধু মন্দিরে ঢুকে দেখতে গেল। যাবার সময় দীনদাসের স্ত্রীকে বলে গেল, তুমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমি দেখে আসছি বন্ধু এখনো এল না কেন।

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বন্ধু দেখল, দেবীমূর্তির সামনে মাথা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে দীনদাস।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে একই সঙ্গে শোকে অভিভূত ও ভীত হয়ে পড়ল সেই বন্ধু। সে ভাবল এই দৃশ্য দেখার পর ফিরে গেলে লোকে বলবে আমিই বন্ধুর স্ত্রীর রূপের মোহে তাকে পাবার জন্য বন্ধুকে হত্যা করেছি। এই নিন্দা ও কলঙ্কের কথা কানে শোনার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল।

এই চিন্তা করে সেও সেই খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকার পর দীনদাসের স্ত্রী অধৈর্য হয়ে উঠল। দুই বন্ধু ফিরে আসছে না দেখে সেও মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ল। দেখল দুই বন্ধুই মাথাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার বুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেল।

সে তখন ভাবতে লাগল, পূর্বজন্মের পাপের জন্যই হয়ত এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে হলো। স্বামীকে অকালে হারিয়ে সারাজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করার থেকে মৃত্যুও অনেক ভাল। তাছাড়া লোকে এই দুটি মৃত্যুর জন্য আমাকেই দায়ী করবে। বলবে আমি দুঃশ্চচিত্রা, তাই নিজের স্বার্থে স্বামী ও তার বন্ধুকে খুন করেছি।

এই ভেবে সে খড়্গ তুলে নিয়ে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হলেই দেবী তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তার হাত ধরলেন। বললেন, বৎস! তোমার সাহস ও সততা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে আর আত্মহত্যা করতে হবে না। বল, কি বর চাও।

দীনদাসের স্ত্রী তখন বলল, হে দেবী, আমাকে যদি কৃপা করো তাহলে এই দুটি মৃতদেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে দাও।

দেবী হেসে বললেন, তাহলে তুমি নিজের হাতে এই দুজনের দেহ ও মাথা এক করে জোড়া লাগিয়ে দাও।

মেয়েটি তখন দেবীর বর পেয়ে আনন্দের আবেগে ভুল করে একজনের মাথা অন্য জনের দেহে লাগিয়ে দিল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, এখন বল ত মহারাজ! এই দুজনের মধ্যে কে মেয়েটির স্বামী হবে?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, তার স্বামীর মাথাটি যে দেহতে লাগানো হয়েছে সে-ই তার স্বামী হবে। সব প্রাণীরই অন্য সব অঙ্গের মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে তাই মাথাকে উত্তমাঙ্গ বলে।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার সপ্তম কাহিনী বলতে শুরু করল।

সপ্তম কাহিনী

সেকালে চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল সুলোচনা আর মেয়ের নাম ছিল ত্রিভুবনসুন্দরী। মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে তার বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন রাজা।

ত্রিভুবনসুন্দরী ছিল রূপে গুণে সমান। তার রূপ গুণের কথা দেশে বিদেশে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তা শুনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠাতে লাগলেন রাজা চন্দ্রাপীডের কাছে। সেই সঙ্গে চিত্রকর দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকিয়ে সেই সব ছবিও পাঠালেন। রাজা সেগুলি বিচারের জন্য মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু পাণিপ্রার্থীদের সেই সব ছবি দেখে একজনকেও পছন্দ হলো না ত্রিভুবনসুন্দরীর।

রাজা তখন মেয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করার মনস্থ করলেন। কিন্তু ত্রিভুবসুন্দরী তাতে রাজী হলো না। সে তার বাবাকে বলল, ও সবের কোন প্রয়োজন নেই। যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি এই তিন গুণের অধিকারী হবেন আমি তাঁকেই বিয়ে করব।

কিছুদিন পর চারজন যুবক রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। রাজা তাদের আপন আপন পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথম যুবক বলল, মহারাজ! আমি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। আর আমার একটি বিশেষ গুণ আছে। প্রতিদিন আমি অপূর্ব কারুকার্যখচিত এক কাপড় বুনে তা বিক্রি করে পাঁচটি করে রত্ন পাই। এই পাঁচটি রত্নের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণকে ও একটি দেবতার উদ্দেশ্যে দান করি। একটি রত্ন আমি নিজে পরি। একটি আমার ভাবী স্ত্রীর জন্য যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখি। বাকি একটি আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য খরচ করি। তাতে আমার ভালভাবেই চলে যায়। এমন গুণ আর কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয় যুবক বলল, আমি পশুপাখিদের ভাষা জানি যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার মত শক্তিশালী পুরুষ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

তৃতীয় জন বলল, আমার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর একজনও নেই। এমন কোন শাস্ত্র নেই যাতে আমার জ্ঞান নেই।

চতুর্থ জন বলল, আমিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। এ ছাড়া আমার একটা বিশেষ গুণ আছে। আমি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করতে পারি।

চারজন যুবকের গুণের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন রাজা চন্দ্রাপীড়। বুঝতে পারলেন এই চারজন পাণিপ্রার্থীই পাত্র হিসাবে উপযুক্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকে কিভাবে বেছে নেবেন তা ভেবে পেলেন না।

রাজা তখন নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে মেয়ের কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। ত্রিভুবনসুন্দরীও সব শুনে কোন কথা বলতে পারল না। বিহ্বল হয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল মহারাজ! এই চারজনের মধ্যে কে ত্রিভুবনসুন্দরীর সবচেয়ে যোগ্য পাত্র।

রাজা বললেন, যে কাপড় বুনে বিক্রি করে সে জাতে শূদ্র। যে পশু-পাখির ভাষা শিখেছে সে বৈশ্য। যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছে সে ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে শব্দভেদী বাণ মারতে শিখেছে সে জাতে ক্ষত্রিয় এবং রাজার স্বজাতীয়। সুতরাং শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখলে এই ক্ষত্রিয় পাত্রই রাজকন্যার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে চলে গেল বেতাল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।

বেতাল এবার অষ্টম কাহিনী বলতে লাগল।

অষ্টম কাহিনী

মিথিলায় গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত যুবক চাকরির আশায় মিথিল নগরে এসে উপস্থিত হয়। অবশেষে সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

কিন্তু রাজা তখন রাজসভায় বসতেন না। অন্তঃপুরের মধ্যেই দিনরাত আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটাতেন। সুতরাং রাজার সঙ্গে কিছুতেই দেখ করতে পারল না চিরঞ্জীব।

মিথিলাতেই এক জায়গায় এক বছর রাজার সঙ্গে দেখা করার আশায় কাটাল চিরঞ্জীব। ক্রমে তার সঙ্গে যা টাকা পয়সা ছিল তা সব খরচ হয়ে গেল। সে দেখল, এরপর তার আর দিন চলবে না। তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে। তার মত শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষে ভিক্ষা করে খাওয়ার থেকে মৃত্যুও অনেক ভাল। অথচ রাজা ছাড়া কেউ তাকে চাকরি দিতে পারবে না এবং রাজার সঙ্গে কখন তার দেখা হবে তার কিছু ঠিক নেই।

সে তাই অনেক ভেবে ঠিক করল, এইভাবে হীন জীবন যাপন করার থেকে বনে গিয়ে ঈশ্বরের তপস্যা করা অনেক ভাল।

সে তাই আর বৃথা কালক্ষেপ না করে তপস্বীর বেশে বনে চলে গেল।

কিছুকাল পর রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর ছেড়ে আবার রাজকার্যে মন দিলেন। একদিন সৈন্যসামন্ত ও লোকজন নিয়ে বনে মৃগয়া করতে গেলেন রাজা। বনের মধ্যে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করে একা একা বনের গভীরে প্রবেশ করলেন রাজা। দেখলেন তাঁর সঙ্গে তখন কেউ নেই।

এদিকে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হরিণটাকেও আর দেখতে পেলেন না। হরিণটা কোথায় কোন দিকে পালিয়েছে অন্ধকারে তাও বুঝতে পারলেন না। সেই অন্ধকারে গভীর বনের মধ্যে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসাও সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। তার উপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছেন তিনি।

যাই হোক, সাহস করে এগিয়ে যাবার পর বনের মধ্যে একটি কুটির দেখতে পেলেন রাজা। আশা জাগল তাঁর মনে। ওখানে নিশ্চয় কোন মানুষ বাস করে।

কুটিরের সামনে গিয়ে দেখলেন একজন সাধু তপস্যা করছে। রাজা করজোড়ে কিছু জল চাইলেন তার কাছে।

জীবনে বীতশ্রদ্ধ সেই রাজপুত যুবকই হলো এই তপস্বী।

চিরঞ্জীব সমাদরের সঙ্গে জল ও ফলমূল এনে দিল রাজাকে। যত্ন করে বসাল তাঁকে।

খুশি হয়ে রাজা বললেন, আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। আমি চিরঋণী রইলাম আপনার কাছে। বাইরে আপনাকে তপস্বী বলে মনে হলেও আপনার চেহারা ও আচরণ দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। দয়া করে অকুণ্ঠভাবে আপনার আসল পরিচয় দান করে আমার মনের সংশয় দূর করুন।

চিরঞ্জীব তখন তার সব বৃত্তান্ত খুলে বলল।

সব শুনে রাজা লজ্জা পেলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দিলেন না। সেই রাতটা তিনি চিরঞ্জীবের কুটিরেই কাটালেন।

পরদিন সকালে রাজা নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে চিরঞ্জীবকে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন, এবার হতে তুমি আমার কাছেই চিরদিন থাকবে।

চিরঞ্জীবও আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল রাজার কথায়। রাজার সঙ্গে সেও রাজপ্রাসাদে চলে গেল। রাজা তাকে তাঁর প্রিয়পাত্র হিসাবে রেখে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে রাজার একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল চিরঞ্জীব।

কোন এক বিশেষ কাজ দিয়ে চিরঞ্জীবকে একবার বিদেশে পাঠালেন রাজা। কাজ শেষ করে ফেরার পথে সমুদ্রের ধারে একটি মন্দির দেখে তার মধ্যে প্রবেশ করল সে। দেবীকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল চিরঞ্জীব।

মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে বীর! এখানে তুমি কি কারণে এসেছ?

চিরঞ্জীব তার বিদেশে আসার কারণের কথা সব বলল।

মেয়েটি বলল, এই সমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে এসে তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তা করব।

চিরঞ্জীব মেয়েটির কথামত সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে উঠে এসে দেখল, সেই মন্দির বা মেয়ে কিছুই নেই সেখানে এবং সে রাজধানীতে তার বাসস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধরনের আশ্চর্যজনক ঘটনা জীবনে কখনো দেখেনি চিরঞ্জীব। যাই হোক, সে রাজার কাছে গিয়ে সব ঘটনার কথা বলল।

সব শুনে এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে চাইলেন রাজা। বললেন, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

চিরঞ্জীব রাজাকে সঙ্গে করে সমুদ্রের ধারে সেই জায়গায় নিয়ে গেল। দেখল মন্দিরটা রয়েছে।

রাজা মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়ে দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বাইরে এসেই সেই পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজা।

সেই মেয়েটিও রাজাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, মহারাজ! আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তা করব।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে করো।

মেয়েটি বলল, আপনার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছি, অন্যকে কি করে বিয়ে করব?

রাজা বললেন, তুমি আগেই স্বীকার করেছ আমার আদেশ মেনে চলবে। সত্য ভঙ্গ করা উচিত নয়।

মেয়েটি তখন বাধ্য হয়ে রাজার কথায় সম্মত হলো। রাজা তখনি মেয়েটির সঙ্গে চিরঞ্জীবের গন্ধর্বমতে বিয়ে দিলেন। তারপর তাদের রাজধানীতে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

চিরঞ্জীবের ঘরসংসার করার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল মহারাজ! রাজা এবং চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী মহৎ।

রাজা বললেন, চিরঞ্জীবই বেশী মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বেতাল বলল, কি করে বুঝলে?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা গুণাধিপ শেষের দিকে চিরঞ্জীবের উপকার করেছেন ঠিক, কিন্তু বনে মৃগয়া করার দিন সন্ধ্যাবেলায় সে রাজাকে খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছিল সত্যিই তার তুলনা হয় না। তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।

রাজার কাছে সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গাছে চলে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে করে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও শুরু করল তার নবম কাহিনী।

নবম কাহিনী

প্রাচীনকালে মগধপুর নামে এক রাজ্যে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজ্যে হিরণ্যদত্ত নামে ধনী বণিক বাস করত। মদনসেনা নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল হিরণ্যদত্তের।

সেদিন ছিল বসন্ত উৎসবের দিন। নতুন সাজপোশাক পরে সখীদের সঙ্গে একটি উপবনে বেড়াচ্ছিল মদনসেনা। এমন সময় সোমদত্ত নামে এক বণিকপুত্র বসন্ত উৎসব উপলক্ষে সেখানে এসে মদনসেনাকে দেখে মুগ্ধ হয় তার রূপে।

সোমদত্ত সোজা মদনসেনার কাছে গিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করল। সে বলল, আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমাকে বিয়ে করে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো তুমি। তুমি আমার এই বাসনা পূর্ণ না করলে আমি তোমারই সামনে আত্মহত্যা করব।

মদনসেনা অনেক করে বোঝাতে লাগল সোমদত্তকে। অনেক সদুপদেশ দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

কিন্তু যুবক সোমদত্ত কোন কথাই শুনতে চাইল না।

অগত্যা মদনসেনা একজন যুবকের প্রাণরক্ষাকে তাব প্রধান ধর্ম বলে মনে করে বলল, আজ হতে পাঁচদিন পর আমার বিয়ে। তবে কথা দিলাম আমার বিয়ের পর তোমার সঙ্গে দেখা না করে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হব না।

এই কথায় কিছুটা শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল সোমদত্ত।

যথাসময়ে বিয়ে হলো মদনসেনার। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বলল না মদনসেনা। বিছানার একপাশে চুপ করে বসে রইল। তার ব্যবহারে তার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলে মদনসেনা সোমদত্তের কথা সব খুলে বলল। বলল, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমাকে পালন করতেই হবে। তার সঙ্গে একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। তুমি আমাকে অনুমতি দাও যাবার।

প্রথমে যেতে দিতে না চাইলেও পরে যাবার অনুমতি দিল মদনসেনার স্বামী।

তখন রাত্রি দুপুর। ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই একলা গয়না পরে সারা গা কাপড়ে ঢেকে সোমদত্তের বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল মদনসেনা।

এক চোর মদনসেনাকে দেখে তার সামনে এসে বলল, তোমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে আমাকে সব দাও।

মদনসেনা তবু নির্ভয়ে বলল, আমি বণিক হিরণ্যদত্তের মেয়ে। স্বামীর অনুমতি নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সোমদত্তের বাড়ি যাচ্ছি।

চোর তখন তার গা থেকে গয়নাগুলো খুলতে উদ্যত হলে মদনসেনা বলল, আমাকে একটু সময় দাও। আমি প্রতিজ্ঞা পালন করে এখনি ফিরে এসে তোমাকে সব গয়না দেব। তুমি একটু অপেক্ষা করো।

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করে চোর তাকে ছেড়ে দিল। পথের উপর সেইখানেই সে মদনসেনার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল।

মদনসেনা সোমদত্তের ঘরে গিয়ে সোমদত্তকে ঘুমোতে দেখে জাগাল তাকে।

গভীর রাতে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে সোমদত্ত বলল, এই গভীর অন্ধকার রাতে একা এলে কি করে ?

মদনসেনা বলল, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই কথা রাখতে এসেছি। আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি। এখন কি চাও বল।

সোমদত্ত বলল, তুমি যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ এবং এত কষ্ট স্বীকার করেছ এতেই আমি খুশি হয়েছি। আর কিছুই চাই না।

আমার সব কথা জেনেও তোমার স্বামী আমার কাছে আসার যে অনুমতি তোমায় দিয়েছে তাতে বোঝা যায় সেও মহৎ। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে সুখী করো।

মদনসেনা এবার সোমদত্তের ঘর থেকে বেরিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে লাগল। দেখল চোর তার অপেক্ষায় সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

চোর ভেবেছিল মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে। সে আর আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তাকে তার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল চোরটি।

মদনসেনা তাকে তার ফিরে আসতে দেরি হওয়ার কারণ বললে চোর বলল, তোমার সততায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার গয়না আর আমি চাই না। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন কর।

কিন্তু স্বামীর কাছে মদনসেনা ফিরে গেলে স্বামী কোন কথা বলল না তার সঙ্গে। সে তার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ! মদনসেনা, সোমদত্ত, মদনসেনার স্বামী আর চোর—এই চারজনের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোরই সবচেয়ে ভাল।

বেতাল বলল, কেন মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, মদনসেনা যা করেছিল তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ প্রতিজ্ঞা পালনের থেকে সতীত্ব রক্ষা নারীর প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য। গভীর অন্ধকার রাতে একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কোন যুবতী স্ত্রীর পক্ষে উচিত কাজ নয়।

মদনসেনার স্বামী তাকে যাবার অনুমতি দিলেও তাকে বিশ্বাস করে খুশি মনে এ অনুমতি দেয়নি। তা যদি দিত তাহলে তার স্ত্রী ফিরে এলে এমন ব্যবহার করত না।

সোমদত্ত প্রথমে মদনসেনাকে পাবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। পরে শাস্তি পাবার ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল। তার কাজের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

চুরি করার সুযোগ হাতে পেয়েও চুরি করেনি চোর। গভীর রাতে নির্জনে মদনসেনাকে একা পেয়ে তার সব গয়না অনায়াসে নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু প্রথমে সে তার কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দেয়। পরে সে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তার গযনা নিতে চায়নি। সামান্য এক চোরের পক্ষে এই ধরনের উদারতা ও মহানুভবতা দেখা যায় না।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে শ্মশানের গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে হাঁটতে লাগলেন আবার।

বেতাল এবার দশম কাহিনী বলতে শুরু করল।

দশম কাহিনী

সেকালে গৌড় দেশে বর্ধমান নামে এক নগর ছিল। সেখানে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রীর নাম ছিল অভয়চন্দ্র। মন্ত্রী অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

মন্ত্রীর মুখ থেকে বুদ্ধের বাণী শুনে রাজাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেই রাজা সারা রাজ্যে দেবদেবীর সব পূজা বন্ধ করে

দিলেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্র মতে কেউ কোন অনুষ্ঠান করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ঘোষণা করে দিলেন।

প্রজারা তা না চাইলেও শাস্তির ভয়ে সব পূজা, কুলাচার ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করল। যারা লুকিয়ে তা করতে লাগল তারা শাস্তি ভোগ করল।

মন্ত্রী অভয়চন্দ্র রাজাকে উপদেশ দিতেন, সব ধর্মের চেয়ে বড় হলো অহিংসা ধর্ম। আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা হলো অহিংসাই পরম ধর্ম। কোন লোক যদি এ জন্মে অন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে নিহত ব্যক্তি পরজন্মে সেই লোককে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেয়। বিরাটকায় ব্যক্তি থেকে অতি ক্ষুদ্র পোকামাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীর প্রাণের মূল্য সমান। তাই তাকে বিনাশ করা মহাপাপ। প্রতিটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা মহৎ কাজ। পরের মাংস খেয়ে যারা নিজেদের দেহের মাংসবৃদ্ধি করে তাদের মত পাপী আর এ জগতে নেই। এ কাজ করলে মৃত্যুর পর নরক ভোগ করতে হয় তাদের।

মন্ত্রীর কাছ থেকে এইসব উপদেশ শুনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে।

কিন্তু রাজা গুণশেখরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ধর্মধ্বজ রাজা হতে বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সারা রাজ্য থেকে। কারণ ধর্মধ্বজ ছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। তিনি রাজা হয়েই বৌদ্ধদের শাস্তি দিতে লাগলেন। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের মাথা মুড়িয়ে গাধার উপর চাপিয়ে সমস্ত নগর ঘুরিয়ে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রজারা আবার তাদের সনাতন হিন্দুধর্ম ফিরে গেল।

বসন্তোৎসবের দিন রাজা তাঁর তিন রাণীকে নিয়ে একটি উপবনে বিহার করতে গেলেন। সেই উপবনের মধ্যে একটি সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটে ছিল। রাজা সেই সরোবর থেকে তিনটি পদ্মফুল এনে তিনজন রাণীকে দিলেন।

কিন্তু একটি ফুল এক রাণীর পায়ে পড়ে যেতে সেই ফুলের আঘাতে তার পা ভেঙ্গে গেল। ব্যথায় কাঁদতে লাগল রাণী।

এর কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদের আলো গায়ে লেগে দ্বিতীয় রাণীর গায়ে ফোসকা পড়ে গেল। সে রাণীও ব্যথায় কাতর হয়ে উঠল।

এমন সময় পাশের এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে হামানদিস্তার শব্দ কানে আসতেই তৃতীয় রাণী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, মহারাজ। বলত, এই তিন রানীর মধ্যে কার শরীর সবচেয়ে কোমল ও স্পর্শকাতর ?

রাজা বললেন, চাঁদের আলো গায়ে লেগে যে রাণীর গায়ে ফোসকা পড়ে সেই রাণীর গা-ই সবচেয়ে কোমল ও স্পর্শকাতর।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার গাছে গিয়ে উঠল। রাজাও আবার তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন।

বেতালও আবার একাদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

একাদশ কাহিনী

পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ ও দানশীল। প্রজারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ।

রাজা একদিন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশকে ডেকে বললেন, সারাজীবন শুধু যদি পরের জন্যই খেটে মরি তা হলে রাজা হয়ে লাভ কি ? তাই ঠিক করেছি এবার থেকে ভোগসুখে দিন কাটাব। আমোদ আহ্লাদ করব। এখন থেকে রাজকার্য তুমিই দেখাশোনা করবে।

মন্ত্রী তাতে বাধ্য হয়ে রাজী হলেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজার সব কাজ মন্ত্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

তবু বাধ্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করে যেতে লাগলেন মন্ত্রী।

অবসর সময়ে এই সব কথা প্রায়ই ভাবতেন মন্ত্রী। একদিন মন্ত্রীর স্ত্রী লক্ষ্মী এসে স্বামীকে চিন্তান্বিত দেখে বলল, সব সময় এত কি ভাব বলত তুমি।

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ বললেন, রাজার সব কাজ চালাতে আমি আর পেরে উঠছি না। এদিকে রাজা আমার উপর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমোদ-প্রমোদ করে দিন কাটাচ্ছেন।

মন্ত্রীপত্নী বলল, রাজকার্য অনেক চালিয়েছ। এখন সব ছেড়ে চল, কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি।

স্ত্রীর কথা এড়াতে না পেরে রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ

করতে চলে গেলেন মন্ত্রী। অনেক তীর্থ ঘুরে শেষে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গেলেন। এখানে রামচন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সেই মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন সত্যপ্রকাশ। দেখলেন সমুদ্রের জল থেকে বিরাট এক সোনার গাছ উঠে এল আর সেই গাছের মাথায় পরমা-সুন্দরী এক মেয়ে বীণা বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাছটি আবার জলের মধ্যে তলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

এই দৃশ্য দেখে আর দেরি না করে দেশে
এসেই রাজার সঙ্গে দেখা করে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের

মন্ত্রীর সব কথা বিশ্বাস করতেন রাজা। তিনি
চোখে দেখার জন্য মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে
পড়লেন।

মন্দিরে মহাদেবের পূজো দিয়ে বাইরে এসে র
পেলেন। সমুদ্রের জলের উপর যেখানে সোনার
তাড়াতাড়ি নৌকোয় করে সেখানে চলে গেলে
গাছটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে গাছটি তাঁকে নি
চলে গেল।

পাতালপ্রদেশে গিয়ে সেই সুন্দরী কন্যা রাজাকে
সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু কে তুমি? কেনই

রাজা বললেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা। আমার
রূপে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছি। আমি তোমাকে স্ত্রী

কন্যা বলল, আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি। কি
চতুর্দশীর দিন তুমি আমার সংস্পর্শে আসতে পারবে না।

রাজা কন্যার এই শর্তে সম্মত হলে গন্ধর্বমতে তাঁদের ...হ হলো। দুজনে সেই পাতালে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন রাণী রাজাকে সেই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তারপর তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল রাজাকে।

রাজাও এই কথা মেনে নিয়ে সরে গেলেন। কিন্তু রাণী কেন তাকে দূরে সরিয়ে দিল এবং কি করবে তা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে অন্ধকারে একটি মুক্ত তরবারি হাতে একটু দূরে লুকিয়ে রইলেন রাজা। রাণী কি করে তা দেখতে চাইলেন।

রাজা দেখলেন রাত্রি গভীর হলে রাণীর ঘরে একটি রাক্ষস এসে রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করল। রাজা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি হাতে সেই রাক্ষসের সামনে এসে বললেন, ওরে দুরাচার রাক্ষস, তোর স্পর্ধা ত কম নয়। তুই আমার রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করছিস ?

এই বলে তরবারির আঘাতে রাক্ষসের মাথা কেটে ফেলল রাজা।

তা দেখে আনন্দে রাণীর চোখ জলে ভরে উঠল। রাণী বলল, তুমি আমায় এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটার কবল থেকে বাঁচিয়েছ। এই রাক্ষসটা প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আসত আমার কাছে। তার ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে ছিলাম আমি। অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত আমায়।

রাজা রাণীর প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন। বললেন, কেন তুমি এই যন্ত্রণা ভোগ করে আসছ ?

রাণী তখন তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল, আমি গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের কন্যা। নাম রত্নমঞ্জরী। বাবা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি ছিলাম তাঁর অতি আদরের মেয়ে। বাবার খাবার সময় আমি কাছে না বসলে তাঁর খাওয়াই হত না। একদিন বাবার খাবার সময় আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়েছিলাম। বাবার খাবার সময়ের কথা আমার মনেই ছিল না। আমি ফিরে এসে দেখলাম আমার জন্য অপেক্ষা করে করে ক্ষুধায় কাতর হয়ে উঠেছেন বাবা। বাবা তখন রেগে গিয়ে আমাকে শাপ দিলেন, তোকে পাতালে গিয়ে বাস করতে হবে আর প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন এক রাক্ষস এসে তোকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেবে।

আমি তখন বাবার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমার সামান্য একটা ভুলের জন্য এত বড় শাস্তি দিলে তুমি। তবে বলে দাও, কিভাবে এবং কখন শাপমুক্ত হব আমি ?

বাবাও তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর স্নেহের কন্যাকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে ফেলেছেন তিনি। তিনি বললেন, মর্ত্যের এক বীর রাজা যেদিন ঐ রাক্ষসকে বধ করবে সেইদিন শাপমুক্ত হবে তুমি।

আমি তাই রোজ একবার করে পাতাল থেকে সমুদ্রের জলের উপর উঠে তাকাতাম চারিদিক। অবশেষে একদিন দেখা হয় তোমার সঙ্গে। আজ এতদিনে শাপমুক্ত হলাম আমি। এখন তোমার অনুমতি পেলে বাবার কাছে ফিরে যাই।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আগে

আমার সঙ্গে আমার রাজধানীতে চল। পরে তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাবে।

রাণী রত্নমঞ্জরী সম্মত হলে রাজা তাকে পরদিনই তাঁর রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন আমোদ আহ্লাদে কাটাবার পর রাজা তাকে তাঁর বাবার কাছে যাবার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু রত্নমঞ্জরী বলল, আমি দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে বাস করে মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমি আর গন্ধর্ব নেই। আমি এই অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে গেলে বাবা হয়ত আমায় আর আগের মত ভাল
তিনি গন্ধর্বদের রাজা। সেটা আরো দুঃখজনক
ইচ্ছা আমি এখানেই থেকে যাই।

রাণীকে ছেড়ে দিতে রাজারও মন চাইছিল
শুনে খুশি হলেন।

রাজা তখন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের হাতে রাজ
প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন।

আবার রাজকার্যের চাপে বিব্রত হয়ে মনের

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলত মহারাজ,

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মন্ত্রী ভাবল, রাজ
সুখে মত্ত হয়ে উঠলে প্রজারা অনাথ হয়ে উঠবে।
ঘটলে দোষ পড়বে মন্ত্রীর উপর। এই দুঃখে মার

সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে গিয়ে ঝুলে রইল
নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও আবার দ্বাদশ কাহিনী শুরু করল।

দ্বাদশ কাহিনী

সেকালে চূড়াপুর নগরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি রূপে গুণে ছিলেন যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ধনসম্পদও ছিল প্রচুর। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। লাবণ্যবতীও ছিল যেমন রূপবতী তেমনি গুণশীলা। সব দিক দিয়েই সে ছিল স্বামীর উপযুক্ত।

স্ত্রীকে নিয়ে সুখেশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন দেবস্বামী।

সেদিন ছিল গ্রীষ্মকালের এক রাত। তাই ঘরের মধ্যে গরমে শুতে না পেরে ছাদের উপর বিছানা পেতে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন দেবস্বামী।

এমন সময় এক গন্ধর্ব রথে করে সেই ছাদের উপর দিয়ে আকাশপথে কোথায় যাচ্ছিল। লাবণ্যবতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্ব তাকে তার রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে দেবস্বামীর সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলেন তার পাশে তার স্ত্রী নেই। তিনি তখন উঠে বাড়িময় খুঁজতে লাগলেন তার স্ত্রীকে। বাড়ির আশেপাশে কোথাও স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে রাতটা কোনরকমে কাটালেন দেবস্বামী।

পরদিন সকালেও চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলেন দেবস্বামী। স্ত্রীকে অকস্মাৎ হারিয়ে বাড়িতে কিছুতেই মন টিকল না দেবস্বামীর। তিনি মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী রূপী দেবস্বামী। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর। আমাকে জল ও আহার দান করে আমার প্রাণ বাঁচান।

ব্রাহ্মণ তখন তাড়াতাড়ি করে একবাটি দুধ এনে খেতে দিলেন দেবস্বামীকে।

এদিকে দৈবক্রমে কিছুক্ষণ আগে এক বিষধর সাপ সেই দুধে মুখ দেওয়ায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে সে দুধ।

তাই দেবস্বামী সে দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে [illegible]ন। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, আমি ত আপনার কোন ক্ষতি করিনি। কেন দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে আমাকে মারলেন?

এই বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনি মারা গেলেন দেবস্বামী।

সাপে মুখ দিয়েছে সেই দুধে একথা ব্রাহ্মণ বা তার স্ত্রী কেউ জানত না। ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে তার স্ত্রীকে গালাগালি করতে লাগল। ব্রাহ্মণীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল ব্রাহ্মণ।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বল মহারাজ! এদের মধ্যে কে দোষী?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, দুধে মুখ দিয়ে সাপ তার স্বভাব অনুসারেই কাজ করেছে। সুতরাং তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী দুধ বিষাক্ত একথা না জেনেই তা অতিথিকে খেতে দেন। সুতরাং তাদেরও দায়ী করা যায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অতিথিরও সে দুধ না খেয়ে উপায় ছিল

না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সব কিছু না জেনে ক্রোধ আর অনুমানের বশবর্তী হয়ে নির্দোষ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজা আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও এবার তার ত্রয়োদশ কাহিনী শুরু করল।

ত্রয়োদশ কাহিনী

হৃদয়পুর নগরে রণধীর নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন সৎ তেমনি সদাশয় ও হৃদয়বান। কোমলতা আর কঠোরতা দুই-ই ছিল তাঁর স্বভাবের মধ্যে। তাঁর সুশাসনে সুখে শান্তিতে বাস করত রাজ্যের প্রজারা।

একবার নগরে চোরের উপদ্রব দেখা দিল। প্রতিদিনই রাত্রিবেলায় নগরমধ্যে বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে চুরি হতে লাগল।

প্রজারা তখন একযোগে রাজার কাছে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা জানাল।

রাজা বললেন, এবার থেকে আর যাতে চুরি না হয় তার ব্যবস্থা করছি আমি। তোমরা যাও।

রাজা প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। রাত্রিবেলায় নগরের বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত করা হলো প্রহরীদের যাতে কোন পথে চোর প্রবেশ করতে না পারে নগরমধ্যে। এরপর রাজা ঘোষণা করলেন, কোন চোর চুরি করে পালিয়ে গেলে সেই অঞ্চলে নিযুক্ত প্রহরীর প্রাণদণ্ড হবে।

প্রহরীরা ভয়ে সতর্ক হয়ে পাহারা দিতে লাগল।

কিন্তু চুরি কমল না এতকিছু সত্ত্বেও। বরং আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। তখন প্রজারা আবার রাজার কাছে এসে প্রতিকার প্রার্থনা করল।

রাজা তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, প্রহরার ব্যবস্থা আরো কঠোর করা হবে।

রাজা এবার ঠিক করলেন, এত প্রহরী থাকা সত্ত্বেও কেন এত চুরি হচ্ছে তা তিনি নিজে সারারাত নগরমধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে দেখবেন।

রাত্রি গভীর হতে একা বেরিয়ে পড়লেন রাজা। পথে একজন অপরিচিত লোককে দেখে রাজা বললেন, কে তুমি? এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি বলল, এত রাতে যখন বার হয়েছি তখন বুঝতেই পারছ আমি কে। আমি চোর। চুরি করাই আমার কাজ। কিন্তু তুমি কে?

রাজা বললেন, আমিও তোমার মতই এক চোর।

চোর খুশি হয়ে বলল, তাহলে চল, একসঙ্গে চুরি করতে যাই। যাক, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

রাজাও রাজী হয়ে গেলেন চোরের কথায়।

সেরাতে নগরে এক ধনীর বাড়িতে চুরি করে অনেক ধনরত্ন পেল চোর।

তারপর চোর রাজাকে সঙ্গে করে নগরবাইরে গিয়ে এক সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়ল। রাজাকে নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পাতালে চলে গেল চোর। তারপর সে তার বাড়ির বাইরে রাজাকে দাঁড়াতে বলে নিজে চলে গেল বাড়ির ভিতরে।

ঠিক এই সময় এক দাসী এসে রাজার সঙ্গে কথা বলে রাজার পরিচয় জানতে পেরে বলল, এই চোর এক দুর্ধর্ষ দস্যু। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও ত এখনি পালিয়ে যাও এখান থেকে।

রাজা বললেন, আমি ত এখান থেকে বার হবার পথ জানি না। তুমি আমাকে দয়া করে পথটা দেখিয়ে দাও।

দাসী রাজাকে পথ দেখিয়ে দিলে তখনি তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলেন রাজা।

পরদিন তিনি অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধের সাজে পাতালে গিয়ে সেই চোরের বাড়িটি আক্রমণ করলেন।

এক রাক্ষস সেই পাতালনগরের রক্ষাকর্তা ছিল। চোর অনেক ধনরত্ন চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাঁর কিছু কিছু রাক্ষসকে দিত।

চোর রাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সেই রাক্ষসের কাছে গিয়ে বলল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে এসে আমার বাড়ি আক্রমণ করেছে। তুমি আমাকে যদি রক্ষা না করো তাহলে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

এই বলে রাক্ষসকে কিছু উপহার দিল চোর।

রাক্ষস বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমি রাজার সৈন্যদের সব খেয়ে ফেলব।

এই বলে রাক্ষস রাজার সৈন্যদের সামনে তাদের ধরে ধরে খেতে লাগল। ভয়ে পালাতে লাগল রাজার সৈন্যরা।

রাজাও অবশেষে পালাতে লাগলেন। তখন সেই চোর সাহস পেয়ে রাজার

পিছু পিছু ধাওয়া করল। পিছন থেকে রাজাকে ডেকে বলল, তুমি ক্ষত্রিয় ও রাজা হয়ে যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাচ্ছ! তোমার নরকবাস হবে।

এই বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে না পেরে রাজা ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেন চোরের সঙ্গে। সে যুদ্ধে পরাজিত হলো চোর। রাজা কিন্তু তাকে প্রাণে না মেরে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

বিচারে প্রাণদণ্ড হলো চোরের। তাকে শূলেতে চড়াবার আদেশ দিলেন রাজা। শূলে চড়াবার আগে তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘোরানো হলো।

সেই নগরে ধর্মধ্বজ নামে এক বণিক ছিল। তার একমাত্র কন্যা শোভনা বাড়ি থেকে চোরকে দেখে তাকে ভালবেসে ফেলল। সে তার বাবাকে বলল, যেমন করে হোক রাজাকে বলে চোরকে মুক্ত করে ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।

বণিক তার মেয়েকে বলল, এই চোরকে ধরার জন্য অনেক সৈন্য সামন্ত ক্ষয় হয়েছে। রাজার প্রাণ অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। সুতরাং রাজা তাকে ছাড়বেন না।

শোভনা বলল, রাজাকে বল, তোমার সব সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি তাকে ছেড়ে দিন।

বণিক ধর্মধ্বজ রাজাকে গিয়ে এই কথা বলল।

কিন্তু রাজা বললেন, এই চোর আমার ও আমার প্রজাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা করেছে। একে কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

বণিক বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে তার কন্যা শোভনাকে বলল একথা। শোভনা কাঁদতে লাগল দুঃখে।

এদিকে বধ্যভূমিতে যথাসময়ে চোরকে এনে শূলের কাছে দাঁড় করানো হলো। শোভনার কথা সে শুনেছিল। নগরের সবাই জানত একথা। চোর একথা শুনে প্রথমে হাসল। তারপর সে কাঁদল। এরপর তাকে শূলে চড়ানো হলো।

মৃতদেহকে চিতায় চাপানো হলো দাহ করার জন্য। শোভনাও চোরের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্য সেখানে এসে চিতায় উঠল।

শ্মশানের পাশেই ছিল কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। শোভনার ভালবাসায়

নিষ্ঠা দেখে দেবী সেই শ্মশানে আবির্ভূত হয়ে চিতা জ্বালানোর আগেই শোভনাকে বললেন, আমি তোমার নিষ্ঠা ও সততায় তুষ্ট হয়েছি। বল, কি বর চাও।

শোভনা চোরের মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, হে দেবী, যদি আমায় কৃপা করো তাহলে এই দেহে প্রাণসঞ্চার করো।

'তথাস্তু' বলে চোরকে প্রাণদান করলেন দেবী।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, আচ্ছা মহারাজ! চোর প্রথমে কেন হেসেছিল এবং পরে কেন কেঁদেছিল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোরটি প্রথমে হেসেছিল এই কারণে যে আমি যখন মরতে চলেছি মেয়েটি তখন আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। পরে সে কেঁদেছিল কারণ মেয়েটি তাকে যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে এমনই হতভাগ্য যে তাকে কিছুই দিতে পারল না।

সঠিক উত্তর পেয়ে রাজার কাঁধ থেকে সোজা গাছে গিয়ে উঠল বেতাল। রাজাও তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার চতুর্দশ গল্প শুরু করল।

চতুর্দশ কাহিনী

কুসুমবতী নগরে সুবিচার নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার চন্দ্রপ্রভা নামে এক কন্যা ছিল।

একদিন রাজধানীর কাছে এক উপকূলে মনস্বী নামে এক রূপবান ব্রাহ্মণকুমার পথে ক্লান্ত হয়ে সেই উপবনে এক গাছের শীতল ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা তার সখীদের সঙ্গে সেই উপবনে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাজকন্যা ও তার সখীদের পায়ের শব্দে মনস্বীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল মনস্বী। এমন রূপসী মেয়ে জীবনে কখনো দেখেনি সে।

রাজকন্যাও মনস্বীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে হলো এমন রূপবান যুবক সে দেখেনি কখনো। সখীরা রাজকন্যার মনের কথা বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে তখনি ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে।

ব্রাহ্মণযুবক মনস্বী রাজকন্যার বিরহে তখনি মূর্ছিত হয়ে পড়ল সেইখানে।

এমন সময় শশী ও ভূদেব নামে দুই পথিক পাশের পথ দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে সেই উপবনে এসে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল। সহসা মূর্চ্ছিত মনস্বীকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

ভূদেব তার সঙ্গী শশীকে বলল, এই যুবকটি অচেতন হয়ে পড়ে আছে কেন ?

শশী বলল, কোন কারণে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

তখন দুজনে মনস্বীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান ফিরে এল মনস্বীর। এবার পথিক দুজন তাকে তার মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করল।

মনস্বী বলল, তোমরা আমার দুঃখ দূর করতে পারবে না। আমার কথা শুনে উপহাস করবে শুধু।

ভূদেব বলল, আমাকে সব কথা খুলে বল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার দুঃখের প্রতিকার করব।

মনস্বী তখন রাজকন্যার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা সব বলল বলল, তার রূপলাবণ্যে আমি এমনই মুগ্ধ হয়েছি যে তাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

ভূদেব তখন তাকে বলল, আমার সঙ্গে চল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

এই বলে মনস্বীকেও তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে মনস্বীকে একাক্ষর একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিল ভূদেব। তারপর বলল, এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি এক যুবতীতে পরিণত হবে এবং ইচ্ছা করলে তোমার বয়স ষোল বছর হয়ে যাবে।

তখন মনস্বী সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে ষোল বছরের এক তরুণী যুবতী পরিণত হলো। ভূদেব হলো আশী বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

এরপর ভূদেব মনস্বীকে নিয়ে তার পুত্রবধূর বেশে সাজিয়ে রাজা সুবিচার কাছে চলে গেল তখনি।

রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে ভক্তিভরে বসতে আসন দিলেন। ভূদেব রাজাকে আশীর্বাদ করে বসল।

রাজা তখন তাদের পরিচয় ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলে ভূদেব বলল, মহারাজ! এ আমার পুত্রবধূ। তাকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে দেখি আমাদের গ্রামে ওলাওঠা মহামারী চলছে। আমার স্ত্রী ও পুত্র গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। আমার এই পুত্রবধূ

আপনার কাছে রেখে আমি দেশে দেশে তাদের খুঁজতে চাই। আপনি আমাদের দেশের রাজা। আপনার মত বিশ্বস্ত আর কে আছে। তাই আপনার আশ্রয়ে আমার পুত্রবধূকে রেখে যেতে চাই। তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে কন্যার মত রাখুন দয়া করে।

রাজা ভাবলেন পরের মেয়েকে ঘরে রাখা উচিত না হলেও রাখতে না চাইলে মনে কষ্ট পাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হয়ে রাজা বললেন ঠিক আছে তাই হোক। রাজা হিসাবে এ কর্তব্য পালন করা আমার উচিত।

ভূদেব রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলে রাজা ব্রাহ্মণবধূ বেশী মনস্বীকে নিয়ে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভার সখী নিযুক্ত করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

রাজকন্যাও তাকে পেয়ে খুশি হলো নতুন সখীকে খুবই ভালবাসতে লাগল চন্দ্রপ্রভা। দুজনের মধ্যে ভালবাসাবাসির এক সম্পর্ক গড়ে উঠল।

একদিন বধূরূপী মনস্বী রাজকন্যাকে বলল, তুমি সব সময় কি চিন্তা কর বলত। তোমার শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে।

রাজকন্যা তখন তার মনের কথা খুলে বলল। বলল, সেই ব্রাহ্মণ যুবককে দেখার পর হতে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে। অথচ তার কোন ঠিকানা জানি না।

মনস্বী বলল, আমি যদি সেই যুবকের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাকে কি দেবে বল।

রাজকন্যা বলল, এটা অসম্ভব ব্যাপার। তবু যদি তুমি তা করতে পার তাহলে আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।

মনস্বী তখন সেই মন্ত্রবলে আবার একজন যুবকে পরিণত হলো। রাজকন্যা বিস্মিত হয়ে কিভাবে কি হলো তা জানতে চাইল।

মনস্বীও প্রথম থেকে সব কথা খুলে বলল। সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব মতে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুকালের মধ্যে রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা হলো।

একদিন মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। রাজকন্যা তার সঙ্গে ব্রাহ্মণবধূরূপী মনস্বীকেও নিয়ে গেল সেখানে। রাজকন্যার সখী ব্রাহ্মণবধূকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল মন্ত্রীপুত্র।

সে তার বন্ধুকে বলল, আমি ঐ কন্যাকে স্ত্রীরূপে না পেলে প্রাণত্যাগ করব।

মন্ত্রীপুত্রের বন্ধু একথা মন্ত্রীকে জানাল এবং মন্ত্রী রাজাকে জানাল। বলল, আপনি যেমন করে হোক ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তা না হলে আমার ছেলের প্রাণ যাবে।

রাজা বললেন, এই কন্যা একজনের বিবাহিত পত্নী। এক ব্রাহ্মণ তাকে আমার আশ্রমে রেখে গেছেন। তার বিনা অনুমতিতে কিছুই করতে পারব না আমি।

মন্ত্রীও নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে তার পুত্রের মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করল। তার কাজকর্ম সব ছেড়ে বাড়িতেই দিনরাত কাটাতে লাগল।

মন্ত্রীর অভাবে কাজকর্মের ক্ষতি হতে লাগল। রাজার কর্মচারিরা রাজাকে বলল, এর একটা বিহিত করুন মহারাজ। মন্ত্রীপুত্র মারা গেলে মন্ত্রীও মারা যাবে। তাঁর মত বিচক্ষণ মন্ত্রী পাওয়া যাবে না।

রাজা একদিন ব্রাহ্মণবধূবেশী মনস্বীর কাছে গিয়ে তাকে সব কথা জানালেন।

মনস্বী বলল, আমি বিবাহিতা নারী, আপনার আশ্রিত। আপনি সুবিচারক হয়ে এই অন্যায় প্রস্তাব কি করে করলেন?

রাজা তা শুনে লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন।

এদিকে মনস্বী ভূদেব ভাবল এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। সে তাই একদিন মন্ত্রবলে পুরুষবেশ ধারণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল।

একথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজা। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে তার পুত্রবধূকে ফিরে চাইলে তিনি তাকে কি বলবেন তা খুঁজে পেলেন না।

এদিকে মনস্বী সোজা চলে গেল ভূদেবের বাড়িতে। ভূদেব সব শুনে তার বন্ধু শশীকে ডেকে তাকে এক যুবক সাজিয়ে নিজে একবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করল।

ব্রাহ্মণযুবকবেশী শশীকে নিয়ে ভূদেব সোজা রাজার কাছে চলে গেল। রাজাকে বলল, আমি আমার পুত্রকে পেয়েছি। এবার পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে চাই।

রাজা তখন ভূদেবকে যা যা ঘটেছে তা সব বললেন। কিন্তু তা শুনে রেগে গেল ভূদেব। রাজাকে বলল, রাজা হয়ে আমার সঙ্গে এইভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা কি উচিত কাজ হয়েছে আপনার?

রাজা বললেন, যে ক্ষতি আমি আপনার করেছি যে কোন মূল্যে তা পূরণ করতে চাই।

ব্রাহ্মণবেশী ভূদেব বলল, তাহলে আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিয়ে দিন। একমাত্র তাহলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে।

রাজা অন্য কোন উপায় না দেখে রাজী হয়ে গেলেন। শুভ দিনে শশীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেন।

শশী রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভূদেবের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে উঠল। তখন মনস্বী এবং শশী দুজনেই রাজকন্যাকে স্ত্রী হিসাবে দাবি করতে লাগল।

মনস্বী বলল, এই রাজকন্যাকে আমি অনেক আগেই গন্ধর্বমতে বিয়ে করেছি।

শশী বলল, রাজা সকলের সামনে রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। রাজকন্যা আমার স্ত্রী।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল মহারাজ ! বলত, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কার স্ত্রী হওয়া উচিত রাজকন্যার ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, মনস্বীর।

বেতাল বলল, শাস্ত্র মতে কন্যার দান, বিক্রয় ও পরিত্যাগে পিতার অধিকার আছে। রাজা সকলের সামনে শশীকে কন্যাদান করেছেন। তবু মনস্বী কোন যুক্তিতে দাবি কবতে পারে তাকে ?

বাজা বললেন, মনস্বী আগেই তাকে বিয়ে করেছে এবং তার ঔরসজাত সন্তান রাজকন্যার গর্ভে আছে। সুতরাং রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হলে তার সতীত্ব ও ধর্ম দুইই বক্ষা হয়।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

বেতালও এবার পঞ্চদশ কাহিনী শুরু করল।

পঞ্চদশ কাহিনী

সেকালে হিমালয়ের পাদদেশে পুষ্প.শের নামে এক নগরে জীমূতকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন গন্ধর্বদের রাজা।

রাজা জীমূতকেতুর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় দীর্ঘকাল ধরে কল্পবৃক্ষের আরাধনা করতে থাকেন।

অবশেষে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা ছেলের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। ছোটবেলা থেকে পড়াশুনোয় ভাল ছিল জীমূত-বাহন। অল্পদিনের মধ্যেই সকল শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে সে।

আর একবার কল্পবৃক্ষের আরাধনা করেন রাজা জীমূতকেতু। এবার তিনি নিজের জন্য কিছু না চেয়ে শুধু প্রজাদের সুখসম্পদ কামনা করলেন কল্পবৃক্ষের কাছে। তাঁর মত প্রজারাও প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে উঠল। ঐশ্বর্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার এল তাদের মনে। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা রাজাকেও মানতে চাইল না। ফলে অরাজকতা দেখা দিল সারা রাজ্যে।

তখন রাজার অমাত্য ও জ্ঞাতিরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলাবলি করতে লাগল, রাজা ও রাজপুত্র সব সময় ধর্মকর্ম নিয়ে থাকায় রাজকার্য পরিচালনায় ঠিকমত মন দেন না। এতে রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। যুবরাজও রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অন্য কোন উপযুক্ত লোককে রাজা করতে হবে।

তারা প্রজাদের বোঝাতে লাগল এই কথা। ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে একদিন রাজপ্রসাদ ঘেরাও করল।

জীমূতবাহন রাজাকে বলল, মহারাজ! আমাদের জ্ঞাতিরা যড়যন্ত্র করে আমাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। আপনি আদেশ দিলে এদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে বিদ্রোহ দমন করি।

রাজা বললেন, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই রাজ্য ও ঐশ্বর্যও ক্ষণস্থায়ী। এই সব কিছুর জন্য যুদ্ধ ও নরহত্যা করে কি লাভ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেও শেষে অনুতাপ করতে হয়েছিল ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তার থেকে চল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের কোন এক নির্জন স্থানে কুটির নির্মাণ করে তপস্যা করি। তাতে অনেক শান্তি পাওয়া যাবে মনে।

এই বলে সেই মুহূর্তে প্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের এক নির্জন স্থানে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন তাঁরা।

সেখানে একদিন রাজকুমার জীমূতবাহনের সঙ্গে এক ঋষিকুমারের বন্ধুত্ব হয়। একদিন দুই বন্ধুতে মিলে বেড়াতে বেড়াতে কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরের কাছে যেতেই দেখল মন্দিরের ভিতর থেকে বীণা বাজানোর শব্দ আসছে।

তখন কৌতূহলী হয়ে তারা দুজনে মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ল। ঢুকেই

দেখল এক পরমাসুন্দরী কন্যা বীণা বাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর স্তবগান করছে। তারা দাঁড়িয়ে তা শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর গান শেষ করে সেই কন্যা জীমূতবাহনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। তাকে ভাল লেগে গেল তার। মনে মনে সে জীমূতবাহনকে স্বামী-রূপে বরণ করে নিল। তারপর সখীদের দিয়ে তার নাম ও পরিচয় জেনে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

সেই কন্যার সখী বাড়ি গিয়ে তার মাকে সব কথা বলল। মা তার মেয়ের কথা স্বামীকে জানাল। কন্যার বাবার নাম ছিল মলয়কেতু।

রাজা মলয়কেতু সব শুনে তার ছেলে মিত্রাবসুকে ডেকে বলল, তোমার বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে হবে। শুনলাম গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু তাঁর পুত্রকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে মলয়পর্বতে এসে বাস করছেন। আমি তাঁর পুত্র জীমূতবাহনের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিতে চাই। তুমি রাজা জীমূতকেতুর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বল।

মিত্রাবসুর কাছ থেকে সব কথা শুনে রাজা জীমূতকেতু তাঁর পুত্র জীমূত-বাহনকে তখনি মিত্রাবসুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

মলয়কেতু এক শুভদিনে জীমূতবাহনের সঙ্গে কন্যা মলয়বতীর বিয়ে দিলেন।

কিছুকাল পর একদিন মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়পর্বতের উত্তর দিকে বেড়াচ্ছিল জীমূতবাহন। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা ঢিবি দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি?

মিত্রাবসু বলল, একসময় গরুড়ের সঙ্গে নাগদের যুদ্ধ হয়। নাগরা পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে। তখন গরুড় তাদের বলে, আহারের জন্য প্রতিদিন তোমরা যদি একটি নাগকে উপহার দিতে পার তাহলে আমি অন্য কাউকে খাব না।

নাগরা গরুড়ের প্রস্তাবে সম্মত হলো। সেদিন থেকে রোজ ওইখানে একটি করে নাগ এসে উপস্থিত থাকে। গরুড় যথাসময়ে এসে সেই নাগকে আহার করে চলে যায়। দীর্ঘকাল ধরে নাগদের হাড় জমে জমে ঐ রকম এক ঢিবি হয়ে যায়।

একথা শুনে নাগদের জন্য মনে ব্যথা পেল জীমূতবাহন। সে তখন মিত্রাবসুকে বিদায় দিয়ে সেই ঢিবির কাছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

সে মনে মনে সংকল্প করল আজ কোন নাগ এলে আমি আমার জীবন দিয়ে তাকে উদ্ধার করব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বৃদ্ধা নাগী এসে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল। জীমূতবাহন তার কাছে গিয়ে বলল, তুমি কাঁদছ কেন মা?

বৃদ্ধা নাগী বলল, আজ আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা। গরুড় এসে তাকে খাবে। আমার আর কোন সন্তান নেই।

জীমূতবাহন বলল, আমি আমার প্রাণ দিয়ে তোমার পুত্রকে রক্ষা করব। তুমি কেঁদো না।

এমন সময় শঙ্খচূড় এসে মার কাছ থেকে সব কথা শুনল। শঙ্খচূড়ের মা জীমূতবাহনকে বলছিল, একজনের প্রাণের বিনিময়ে আমার ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পারব না।

শঙ্খচূড় জীমূতবাহনকে বলল, আপনি ধর্মপ্রাণ ও দয়ালু। আমার মত সামান্য এক প্রাণীকে বাঁচাতে আপনার মত এত মহৎ প্রাণ নষ্ট হওয়া উচিত নয়। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণীর উপকার হবে।

জীমূতবাহন বলল, শোন শঙ্খচূড়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ বাঁচাব। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না।

এই বলে শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়ে গরুড়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে।

জীমূতবাহন কোন কথা শুনবে না দেখে শঙ্খচূড় দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

এদিকে গরুড় যথাসময়ে এসে জীমূতবাহনকে পেয়েই তাকে ঠোঁটে করে নিয়ে আকাশে ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। জীমূতবাহনের ডান হাতে একটি কেয়ূর ছিল। সেটাতে রক্ত লেগে গেল। সেই রক্তমাখা কেয়ূরটা উপর থেকে মলয়বতীর সামনে পড়ে গেল। সেই কেয়ূরে জীমূতবাহনের নাম লেখা ছিল।

তা দেখে রাজবাড়ির সকলেই কান্নাকাটি করতে লাগল। মলয়কেতু চারদিকে লোক পাঠাল জামাইএর খোঁজে।

এদিকে শঙ্খচূড় গরুড় যেখানে উড়ছিল তার নিচে দাঁড়িয়ে গরুড়ের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি যাঁকে খাবার জন্য ধরেছ তিনি ধর্মপ্রাণ জীমূতবাহন। তিনি তোমার নির্দিষ্ট আহার নন, আমিই তোমার নির্দিষ্ট আহার। তুমি আমাকে আহার করো।

গরুড় এতক্ষণে বুঝতে পারল সে যাকে ধরেছে সে কোন নাগ নয়, একজন গন্ধর্ব।

জীমূতবাহন তখন মৃতপ্রায়। গরুড় তাকে বলল, তুমি নিজের জীবন দিয়ে পরকে বাঁচাতে চাইছ কেন ?

জীমূতবাহন বলল, মরতে ত একদিন হবেই। তুদিন আগে মরে যদি কারো উপকার করা যায় তাহলে এ জীবন সার্থক হবে আমার।

এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে গরুড় বলল, সত্যিই তুমি ধর্মপ্রাণ ও হৃদয়বান। বল, কি বর চাও।

জীমূতবাহন বলল, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে বর দেন তাহলে বলুন আজ হতে আর কোন নাগকে ভক্ষণ করবেন না। আর যে সব নাগদের খেয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের জীবন ফিরিয়ে দিন।

গরুড় তাতে সম্মত হয়ে তখনি অমৃত এনে সেই হাড়গুলোর ঢিবিতে খানিকটা ঢেলে দিতেই মৃত নাগরা বেঁচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

গরুড় তখন জীমূতবাহনকে বলল, শোন রাজকুমার, আমার কৃপায় তুমি তোমাদের রাজ্য ফিরে পাবে।

চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। মলয়কেতু তা শুনে খুশি হলো। জীমূতকেতুর রাজ্যের প্রজারা ভুল বুঝতে পেরে জীমূতকেতুর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তাঁকে আবার রাজা করল।

এইখানেই গল্প শেষ করল বেতাল। তারপর রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বলুন মহারাজ ! জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড় এই তুজনের মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশী ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, শঙ্খচূড়ের।

বেতাল বলল, তা কি করে হয় ? যে ব্যক্তি পরের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিতে গেল তার মহত্ত্ব বেশী হবে না ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, জীমূতবাহন জাতিতে ক্ষত্রিয়। প্রাণদান তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। যে কোন ক্ষত্রিয়ই একাজ করতে পারত। কিন্তু শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের প্রাণদানের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হয়নি। পরে তাকে নিরস্ত করতে না পেরে সে দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে তার জীবনের জন্য প্রার্থনা করেছে। তারপর আবার নিজের প্রাণের বিনিময়ে জীমূতবাহনকে বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল গরুড়ের কাছে।

এবার সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার তার ষোড়শ গল্প বলতে লাগল।

ষোড়শ কাহিনী

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বণিক বাস করত। উন্মাদিনী নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটির রূপলাবণ্য এত বেশী ছিল যে রত্নদত্ত মনে করত তার মেয়ে রাজরাণী হবার উপযুক্ত।

মেয়ের বিয়ের বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে রত্নদত্ত সেই দেশের রাজার কাছে চলে গেল। সে রাজাকে বলল, মহারাজ, আমার এক রূপসী মেয়ে আছে। আপনি তাকে একবার দেখে আসুন।

রাজা তা শুনে নিজে না গিয়ে কয়েকজন মন্ত্রীকে পাঠালেন।

মন্ত্রীরা মেয়েটিকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হলো। দেখল মেয়েটি সত্যিই রূপসী। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, মেয়েটির রূপ এত বেশী যে রাজা তাকে পেয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বেন একেবারে। তিনি আগের মত রাজকার্য না করে অন্তঃপুরে রাণীর কাছেই সব সময় কাটাবেন। তাতে রাজ্যের ক্ষতি হবে।

তাই মন্ত্রীরা একমত হয়ে রাজার কাছে ফিরে এসে জানাল, মেয়েটি সুন্দরী হলেও রাজরাণী হবার মত সুন্দরী নয়। তাছাড়া তার লক্ষণ ভাল নয়।

মন্ত্রীদের কথায় বিশ্বাস করে রাজা তার মেয়েকে বিয়ে করবেন না জবাব দিলেন রত্নদত্তকে। তখন রত্নদত্ত রাজার সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর উন্মাদিনী স্বামীর কাছে এসে সুখেশান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগল। কিন্তু রাজা তাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করে যে অপমান করেছেন তা সে ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। তাই মনের মধ্যে প্রায়ই একটা জ্বালা অনুভব করত সে।

শীত গিয়ে বসন্তকাল এল। বসন্তোৎসবের দিন মহা ধূমধাম হয় নগরে। বসন্তোৎসবের দিন হাতির পিঠে চড়ে নগর পরিক্রমা করতে বার হলেন রাজা। একদল লোক দামামা বাজাতে বাজাতে তাঁর আগে আগে যেতে লাগল।

দামামার শব্দ শুনতে পেয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়াল উন্মাদিনী। নিজের অসাধারণ রূপলাবণ্য একবার রাজাকে শুধু দেখাতে চায় সে। রাজা নিজের চোখে দেখুক, অপরের কথায় কেন এমন মেয়েকে প্রত্যাখ্যান

করেছেন। এইভাবে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেই তাঁর উপর প্রতিশোধ নেওয়া সার্থক হবে উন্মাদিনীর।

উন্মাদিনীর বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল রাজার হাতিটি। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা উন্মাদিনীর উপর চোখ পড়ল রাজার। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এক মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল ও হতবাক হয়ে গেলেন রাজা। দেখলেন রূপ নয়, যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। মনে হলো এমন রূপসী মেয়ে জীবনে কোথাও কখনো দেখেননি তিনি এর আগে।

যে সব মন্ত্রীরা এই মেয়েকে বিয়ে করতে দেয়নি তাঁকে, যারা এই মেয়েকে কুলক্ষণা বলে বাতিল করে দেয় তাদের উপর প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেন রাজা। সেই সব মন্ত্রীদের নির্বাসনদণ্ড দান করলেন।

সেইদিন থেকে রাজা সব কাজকর্ম ও চিন্তা ত্যাগ করে দিনরাত শুধু উন্মাদিনীর রূপের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর কেবলি অনুশোচনা হতে লাগল নিজের দোষে পরের কথায় এক উজ্জ্বল নারীরত্নকে হারিয়েছেন তিনি।

এই সব ভাবতে ভাবতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল অন্তর। দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল তাঁর দেহটা। দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর মনের দুঃখের কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না তিনি লজ্জায়। মনের গোপন কথা গোপনেই রয়ে গেল।

অবশেষে রাজার কয়েকজন অন্তরঙ্গ এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কথায় কথায় রাজার কাছ থেকে তাঁর মনের কথা জেনে নিল।

বন্ধুরা সব কিছু জেনে রাজাকে পরামর্শ দিল, আপনি কেন বৃথা মন খারাপ করে নিজেকে ক্ষয় করছেন মহারাজ? যে মেয়েকে না পেয়ে আপনার এই অবস্থা হয়েছে সে মেয়ে ত আপনার হাতের কাছেই আছে। আপনারই অধীনস্থ কর্মচারি সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার।

কিন্তু ধর্মপ্রাণ রাজা বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি পরিষ্কার বললেন, আমি রাজা হয়ে এই অপকর্ম করতে পারব না। যে কাজের জন্য পরকে শাস্তি দিই সে কাজ কেমন করে করব আমি?

সব কিছু শুনে সেনাপতি বলভদ্র রাজার কাছে এসে তাঁর পা ধরে বলল, মহারাজ, আমি আমার স্ত্রীকে অকুণ্ঠচিত্তে দান করছি আপনাকে। আমার স্ত্রীকে আপনি আপনারই দাসী বলে মনে করবেন। তাতেও যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আমি কোন মন্দিরে গিয়ে শপথ করে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করব। আপনি তারপর তাকে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু রাজা কিছুতেই রাজী হলেন না সেনাপতির কথায়। তিনি শুধু বললেন, আমি রাজা হয়ে যদি অন্যায় ও অধর্ম করি তাহলে প্রজারা কখনই ন্যায়ও ধর্মপথে চলতে পারে না। তাহলে লোকে কি বলবে আমায়? আমি যদি এই কাজ করি তাহলে ইহকালে সুখ পেলেও পরকালে দুঃখ পেতে হবে। তুমি যদি আমাকে শ্রদ্ধা করো, যদি আমার মঙ্গল চাও তাহলে এই অন্যায় ও অধর্ম করতে কেন প্ররোচিত করছ আমায়? তুমিই বা কেন ধর্মপত্নীকে বিনা দোষে ত্যাগ করবে? তা যদি করো তাহলে তোমাকেও শাস্তি দিতে হবে আমায়।

বিফল হয়ে চলে গেল সেনাপতি।

এরপর রাজ্যের প্রজারাও রাজার কাছে এসে সকলেই সেই একই অনুরোধ করল। সকলেই রাজাকে অনুরোধ করল, আপনি সেনাপতির স্ত্রীকেই আপনার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন।

কিন্তু এই অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন রাজা দৃঢ়তার সঙ্গে।

দিনে দিনে রাজার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। রাজাকে সবাই ভালবাসত। সেনাপতি বলভদ্র রাজার শরীরের অবস্থা দেখে চিন্তা করতে লাগল।

অবশেষে একদিন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দিল বলভদ্র।

গল্প শেষ করে বেতাল বললল, বলত রাজা! রাজা ও সেনাপতি দুজনের মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশী?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজার মহত্ত্বই বেশী।

বেতাল বলল, তা কেন হবে? সেনাপতিই ত বেশী প্রশংসা পাবার যোগ্য। কারণ সে সুন্দরী নারীসঙ্গ উপভোগের স্বাদ জেনেও রাজার প্রতি ভক্তি-বশতঃ স্ত্রীকে দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজা ত নারীসঙ্গ কেমন তা জানতেনই না।

রাজা বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, ভৃত্যরা নিজেদের প্রাণ দিয়েও প্রভুর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়। সেনাপতি যা করেছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু রাজারা সাধারণতঃ মত্ত হস্তীর মত শক্তির দ্বারা নিজেদের ভোগবাসনা মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এই রাজা সারা দেশের অধিপতি হয়েও অধর্ম করেননি। বরং তিনি ত্যাগের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন। অন্যায়ভাবে অধর্মের পথে নিজের বাসনাকে চরিতার্থ করতে চাননি। তাই রাজার মহত্ত্বই বেশী।

রাজার কাছে ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার তাঁর কাঁধ ছেড়ে গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার সপ্তদশ কাহিনী শুরু করলেন।

সপ্তদশ কাহিনী

সেকালে হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার ছেলের নাম ছিল গুণাকর। বিষ্ণুশর্মা নিজে পরম ধার্মিক প্রকৃতির হলেও তার ছেলে গুণাকর ছিল অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির।

গুণাকর দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলায় খুব বেশী আসক্ত ছিল। পাশাখেলার পণে হারতে হারতে তার সব সঞ্চয় ফুরিয়ে যায়। তখন সে চুরি করতে আরম্ভ করে। এজন্য ধর্মপ্রাণ বিষ্ণুশর্মা রাগে ও লজ্জায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় গুণাকরকে।

বাড়ি থেকে নিরাশ্রয় হয়ে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল গুণাকর। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক শ্মশানে এসে দেখল একজন সন্ন্যাসী যোগসাধনা করছে।

সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তার পাশে দাঁড়াল গুণাকর।

সন্ন্যাসী তাকে দেখে বুঝল সে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। তাই সে একটি নরক-পালে করে কিছু ভাত তরকারি এনে খেতে দিল।

কিন্তু গুণাকর তা খেল না।

সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝতে পেরে যোগাসনে বসে চোখ বন্ধ করতেই এক যক্ষিণী এসে তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বলল, আদেশ করুন প্রভু।

সন্ন্যাসী বলল, এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ আমার আশ্রমে এসেছে। তার আহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করো।

যক্ষিণীর মায়াশক্তিবলে সেইখানে তখনি এক সুরম্য প্রাসাদ দেখা দিল। যক্ষিণী গুণাকরকে সেই প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে অনেক রকম উপাদেয় খাদ্য দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করাল। রাতটা সেই প্রাসাদেই কাটাল গুণাকর।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল, সেই প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। গুণাকর তখন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সন্ন্যাসী বলল, যার যোগবিদ্যা জানা নেই যক্ষিণী তার ডাকে আসবে না।

গুণাকর তখন সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, প্রভু, আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই। আপনি আমায় যোগবিদ্যা শিখিয়ে দিন।

গুণাকরের ভক্তি ও আগ্রহ দেখে দয়া হলো সন্ন্যাসীর। সে তখন গুণাকরকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলল, চল্লিশ দিন দুপুর রাতে জলে গলা ডুবিয়ে একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করবে।

গুণাকর চল্লিশ দিন এইভাবে মন্ত্র জপ করার পর সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এসে বলল, এবার কি করতে হবে বলুন।

সন্ন্যাসী বলল, আরো চল্লিশ দিন চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে এই মন্ত্র জপ করতে হবে। তাহলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

গুণাকর বলল, আমি অনেকদিন বাড়ি থেকে এসেছি। বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। আগে বাবা মাকে দেখে আসি। তারপর আপনার কথামত কাজ করব।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ি চলে গিয়ে দেখা করল বাবা মার সঙ্গে। গুণাকর সব ঘটনার কথা বলল। তারপর সে বলল, দেখা করেই আবার চলে যাবে বাড়ি থেকে। সে তার যোগসাধনার কথাও বলল।

মা বলল, বাবা মার মনে দুঃখ দিয়ে যোগসাধনার কোন ফল পাবি না। ঘরে সংসারধর্ম পালন করলেই যোগসাধনার ফল পাবি। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাই হলো পরম ধর্ম।

গুণাকর বলল, এই অসার মায়াময় সংসারে আবদ্ধ থেকে আর আমি ভুল করব না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না।

এই বলে বাবা মাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল গুণাকর। সে ফিরে গেল সন্ন্যাসীর কাছে।

কিন্তু চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দিন মন্ত্র জপ সত্ত্বেও কোন ফল হলো না। বাবা মাকে কাঁদিয়ে বাড়ি ছেড়ে এসে সাধনায় সিদ্ধ হতে পারল না সে।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ বলত, এত কিছু করেও ব্রাহ্মণযুবক গুণাকর এত জপ তপ ও সাধনা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারল না কেন ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, গুণাকরের যোগ সিদ্ধিলাভের বাসনা থাকলেও তার সাধনায় একাগ্রতা ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে তার সাধনা শেষ না হতেই বাবা মাকে দেখার জন্য বাড়ি যেত না।

এই কথা শুনে বেতাল মনে মনে রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করে আবার গাছে গিয়ে ঝুলে থাকল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার অষ্টাদশ কাহিনী বলতে শুরু করল।

অষ্টাদশ কাহিনী

কুবলয়পুর নামে এক গ্রামে ধনপতি নামে এক বণিক বাস করত। ধনবতী নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। গৌরীদত্ত নামে এক বণিকপুত্রের সঙ্গে অল্প বয়সেই বিয়ে হয় ধনবতীর।

বিয়েব কয়েকবছর পর ধনবতীর একটি কন্যাসন্তান হয়। ধনবতী তার নাম রাখে মোহিনী। হঠাৎ ধনবতীর স্বামী গৌরীদত্ত অকালে মারা যান। তখন তার আত্মীয়েরা ধনবতীকে অসহায় দেখে তার বিষয় সম্পত্তি সব কেড়ে নেয়।

শেষকালে প্রাণহানির আশঙ্কা দেখে একদিন অন্ধকার অমাবস্যার রাতে স্বামীর ঘর ছেড়ে মেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ির পথে রওনা হয়ে পড়ে ধনবতী।

অন্ধকার রাতে পথ চলতে চলতে ভুল করে এক শ্মশানে গিয়ে ওঠে ধনবতী।

সেই শশ্মানে এক চোর রাজার দণ্ডাদেশে শূলের উপর বসে ছিল। রাজার আদেশে তাকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিন দিনেও তার মৃত্যু হয়নি। শূলের উপর বসে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছিল চোর। তার প্রাণ বার হচ্ছিল না কিছুতে।

অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে চোরের গায়ে ধাক্কা লাগল ধনবতীর। চোর তখন তাকে বলল, কে তুমি? আমার এই কষ্টের উপর তুমি আবার আমায় কষ্ট দিলে কেন?

ধনবতী বলল, আমি দেখতে পাইনি। জেনে শুনে কষ্ট দিইনি তোমায়। কিন্তু এই অন্ধকারে একা বসে এখানে কষ্ট ভোগ করছ কেন?

চোর বলল, আমি জাতিতে বণিক। কিন্তু চুরির অপরাধে রাজা আমাকে শূলদণ্ড দিয়েছেন। জন্মকালে এক জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছিল

অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে না। এখন বুঝতে পারছি আজ তিন দিন হলো শূলে বসে আছি, তবু মৃত্যু হচ্ছে না কেন আমার। অথচ এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না আর আমি। এখন একমাত্র তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে পার। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেই আমার মৃত্যু হবে। আমার যে ধনসম্পদ আছে আমি তা তোমায় দিয়ে যাব।

ধনবতীর কিছুটা আগ্রহ হলেও মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে ধনবতী বলল, তুমি ত এখনি মারা যাবে। তাহলে আমার মেয়ে ত কখনো ছেলের মুখ দেখতে পাবে না।

চোর বলল, আমি অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি তোমার মেয়ে বড় হলে কোন ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দেবে। তাহলে সে সন্তান লাভ করবে।

ধনবতী তখন সেই চোরের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিল।

চোর বলল, ঐ সামনের গ্রামেই আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে একটা কূয়োর কাছে একটা বটগাছের নীচে আমার সমস্ত ধনরত্ন মাটিতে পোঁতা আছে। সেগুলো নেবার ব্যবস্থা করো।

এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মৃত্যু হলো।

চোরের কথামত ধনবতী সেই গ্রামে চোরের বাড়িতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে সব ধনরত্ন নিয়ে তার বাপের বাড়ি চলে গেল। সেইখানেই সে বাস করতে লাগল মেয়েকে নিয়ে।

ক্রমে তার মেয়ে মোহিনীর বিয়ের সময় হলে মোহিনীর পছন্দমত এক ব্রাহ্মণ যুবককে বাড়িতে এনে তার সঙ্গে আবার বিয়ে দিল ধনবতী। বিয়ে দিয়ে বাড়িতেই রেখে দিল তাদের।

কিছুকাল পরে একটি পুত্রসন্তান হলো মোহিনীর।

এর পর একদিন মোহিনী স্বপ্ন দেখল, মহাদেবের মত দেখতে এক দেবতা এসে তাকে বলছে, তোমার ছেলে ক্ষণজন্মা পুরুষ। আগামীকাল মাঝরাতে একটি বাক্সের মধ্যে তোমার ছেলেকে ভরে সঙ্গে একহাজার মোহর দিয়ে রাজবাড়ির সামনে সদর দরজার কাছে রেখে দিয়ে আসবে। অপুত্রক রাজা তাকে যত্ন করে মানুষ করে তুলবে। ভবিষ্যতে সে-ই রাজা হবে। মোহিনী ঘুম হতে জেগে উঠে তার মাকে সব কথা বলল। তার স্বপ্নের কথামত ছেলেকে মোহরসহ একটা বাক্সের মধ্যে ভরে রাজবাড়ির সামনে গভীর রাতে নামিয়ে দিয়ে এল।

এদিকে রাজাও সেই একই ধরনের এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন স্বপ্নে দেবতার মত এক দিব্য পুরুষ তাঁকে বলল, বাড়ির বাইরে সুলক্ষণ যুক্ত এক শিশু তোমার অপেক্ষায় আছে। তাকে গ্রহণ করে পুত্রের মত পালন করো। ভবিষ্যতে সেই ছেলে রাজা হয়ে মুখ উজ্জ্বল করবে তোমার।

ঘুম ভাঙ্গতেই রাণীকে একথা বললেন রাজা। দুজনেই তখন কৌতূহলী হয়ে প্রাসাদের সদর দরজা খুলেই একটি বাক্স দেখতে পেলেন। বাক্সটি খুলেই দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি এক শিশু শুয়ে আছে তাতে। তার পাশে রয়েছে এক হাজার মোহর।

রাণী খুশি হয়ে কোলে তুলে নিলেন শিশুকে।

পণ্ডিতদের ডেকে পরদিনই ছেলের ভাগ্য গণনা করালেন রাজা।

পণ্ডিতগণ একবাক্যে বললেন, এই ছেলে বড়ই সুলক্ষণযুক্ত। ভবিষ্যতে এই ছেলেই আপনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে আপনার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

ছেলের বয়স ছয়মাস হলে তার অন্নপ্রাশন হলো। রাজা তার নাম রাখলেন হরিদত্ত।

হরিদত্ত ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। যথাকালে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল সে।

পরে রাজার মৃত্যু হলে হরিদত্ত রাজা হলো। ক্রমে সে রাজ্য আরও বাড়িয়ে নিজের একাধিপত্য স্থাপন করল।

কিছুদিন পর তীর্থযাত্রায় বার হলো হরিদত্ত। বহু তীর্থ ঘুরে শেষে গয়ায় এসে পিণ্ডদান করতে বসল। কিন্তু সে পিণ্ডদান করতে গেলে জল থেকে তিনখানা হাত উঠে এল তার সামনে। একটি হাত চোরের, একটি রাজার আর একটি সেই ব্রাহ্মণ যুবকের।

বেতাল গল্প শেষ করে বলল, এই তিন জনের মধ্যে কে হরিদত্তের পিণ্ড পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী? শাস্ত্রমতে যুক্তিসহ এর উত্তর দাও।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোরের। কারণ ব্রাহ্মণ যুবক হরিদত্তের জনক যে সে নিজেকে বিক্রি করেছিল টাকার জন্য। রাজাও প্রতিপালনের জন্য এক হাজার মোহর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই চোর অনাগত সন্তানের জন্য তার যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিল।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার শিরীষ গাছে উঠে ঝুলে পড়ল। রাজাও তাকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথচলা শুরু করলেন।

বেতালও তার উনবিংশ কাহিনী শুরু করল।

ঊনবিংশ কাহিনী

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন ঘোড়ায় চড়ে বনে মৃগয়া করতে যান রাজা রূপদত্ত। কিন্তু সেদিন হরিণ শিকার করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে এক ঋষির তপোবনে গিয়ে উপস্থিত হন। তপোবনের সামনে ছিল স্বচ্ছনীল জলে ভরা এক সুন্দর সরোবর।

এমন সময় রাজা দেখলেন আশ্রম থেকে এক পরমাসুন্দরী ঋষিকন্যা বেরিয়ে এসে স্নান করার জন্য সরোবরে নামল। তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হলেন রাজা।

ঋষিকন্যা স্নান সেরে তীরে উঠে আশ্রমের দিকে এগিয়ে যেতেই রাজা তার সামনে গিয়ে বললেন, আমি ক্লান্ত, তোমার অতিথি।

এমন সময় ঋষিও ফল ফুল সমিধ প্রভৃতি নিয়ে ফিরে এলেন।

রাজা ঋষিকে দেখে তাঁর পায়ে জড়িয়ে প্রণাম করলে ঋষি আশীর্বাদ করলেন, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

রাজা বললেন, আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। আমার এই মনোবাসনা পূর্ণ করুন প্রভু।

এ কথায় রাজার উপর ঋষি রেগে গেলেও বাইরে সে রাগ প্রকাশ না করে রাজার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলেন।

নববধূ ঋষিকন্যাকে নিয়ে রাজধানীর পথে রওনা হলেন রাজা। পথে রাত হলে বনপথের ধারে কিছু ফল খেয়ে একটি গাছের তলায় দুজনে শুয়ে রইলেন।

দুপুর রাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে জাগিয়ে বলল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি তোমার স্ত্রীর নরম মাংস খেতে চাই।

রাজা বললেন, তুমি আমার স্ত্রীর মাংসের বদলে অন্য যা কিছু চাইবে আমি তা দেব তোমাকে।

রাক্ষস বলল, যদি বারো বছরের এক ব্রাহ্মণের ছেলের মাথা কেটে আমাকে দিতে পার তাহলে আমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দেব।

রাজা তাঁর নববধূকে বাঁচাবার জন্য এই পাপকর্মে সম্মত হলেন। তিনি রাক্ষসকে বললেন, সাত দিন পর তুমি আমার রাজধানীতে এলে তুমি যা চাও তা পাবে।

রাক্ষস তখন রাজা ও তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে দিল।

পরদিন রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হয়েই মন্ত্রীকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলো।

মন্ত্রী বলল, আপনি কিছু ভাববেন না মহারাজ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

এরপর মন্ত্রী এক স্বর্ণকারকে ডেকে মানুষের মত এক সোনার মূর্তি তৈরি করাল। তারপর সেই মূর্তির গায়ে গয়না পরিয়ে বাজধানীতে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘোষণা করল, যে ব্রাহ্মণ তার বারো বছরের ছেলেকে বলিদান দেবেন তিনিই এই মূর্তিটি পাবেন।

সেই নগরে এক ব্রাহ্মণের বারো বছরের একটি ছেলে ছিল। তারা ছিল দারুণ গরীব। অতি কষ্টে দিন চলত তাদের। দুবেলা আহার জুটত না।

রাজার ঘোষণার কথা শুনে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলল, এই দারিদ্র্য আর সহ্য করা যাচ্ছে না। কোনদিন দুবেলা জোটে, কোনদিন জোটে না। ছেলেটারও কষ্ট হচ্ছে খাওয়া পরার। তার থেকে ছেলেটাকে বলি দাও। তাহলে আমরা ঐ সোনার মূর্তিটা আর তার গায়ের গয়নাগুলো সব পাব। এইভাবে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হব আমরা।

ব্রাহ্মণীও এ কথায় সম্মত হলো। ব্রাহ্মণ তখন তার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে তুলে দিয়ে সেই সোনার মূর্তিটি পেয়ে গেল। তারপর সেটা বিক্রি করে প্রচুব টাকার মালিক হলো।

রাজা বারো বছরের এক ব্রাহ্মণপুত্রকে পেয়ে খুশি হলেন। রাক্ষস তাঁকে এই কথাই বলেছিল। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে রাক্ষস এসে উপস্থিত হলে রাজা নিজের হাতে খড়্গ দিয়ে ব্রাহ্মণ বালকের মাথা কেটে রাক্ষসকে দিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র কি জন্য কিভাবে তার অকালে মৃত্যু ঘটছে তা সব বুঝতে পারল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শুধু একটু খানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

এখানেই গল্প শেষ কার বেতাল বলল, মহারাজ! ব্রাহ্মণপুত্র মৃত্যুর পূর্বে হেসেছিল কেন? মৃত্যুর আগে ত ভয়ে সবাই কাঁদে।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, পিতামাতা ও রাজার কর্তব্যজ্ঞান দেখে সে নিতান্ত বালক বয়সেই না হেসে পারেনি। বাপ মার কাজ হচ্ছে সব বিপদ থেকে ছেলেকে রক্ষা করা। কিন্তু নিজেদের ভোগ সুখের জন্য সেই ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তার বাবা মা। তারপর রাজার ধর্ম হচ্ছে প্রজা পালন করা এবং তাদের রক্ষা করা। কিন্তু সেই রাজা নিজের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য

নিজের স্বার্থে একটি নির্দোষ নিরীহ বালককে হত্যা করলেন নিজের হাতে। বালক মনে মনে এই কথা স্মরণ করে হেসেছিল।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজাকে ছেড়ে গাছের উপর চলে গেল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো।

বেতালও এবার বিংশতি কাহিনী বলতে শুরু করল।

বিংশতি কাহিনী

বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে এক বণিক নাম করত। অনঙ্গমঞ্জরী নামে এই বণিকের একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল।

কিছুকাল দেখাশোনার পর কমলপুর গ্রামের অধিবাসী মদনদাস বণিকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল অর্থদত্ত।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই মদন দাস তার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে রেখে বিদেশে বাণিজ্য করতে গেল।

একা একা থাকতে ভাল লাগল না অনঙ্গমঞ্জরীর। সে প্রায়ই তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখত।

একদিন এইভাবে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অনঙ্গমঞ্জরী যখন রাস্তায় লোক চলাচল দেখছিল তখন সেই পথ দিয়ে কমলাকর নামে এক সুদর্শন ও সুপুরুষ ব্রাহ্মণ যুবক যাচ্ছিল। তাকে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল অনঙ্গমঞ্জরী। অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখেও মুগ্ধ হলো কমলাকর। দুজনেই দুজনকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

অনঙ্গমঞ্জরী বেশী কাতর হয়ে উঠল। সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়। তাকে মরণাপন্ন দেখে তার সখী কমলাকরকে ডেকে নিয়ে এল। কিন্তু কমলাকর এসে দেখল অনঙ্গমঞ্জরী তারই বিরহে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সেই দুঃখে সেও মাটিতে পড়ে গিয়ে তখনি মারা গেল।

বাড়ির ও পাড়ার লোকেরা সব কিছু জানতে পেরে শ্মশানে নিয়ে গেল দুটি মৃতদেহকে। একই চিতায় তাদের দাহ করা হল।

এমন সময় অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী মদন দাস বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে অনঙ্গমঞ্জরীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। সেখান থেকে সোজা শ্মশানে চলে গেল। সব কিছু শুনে সে স্ত্রীর শোকে সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ! এই তিনজনের মধ্যে কার ভালবাসা সব চেয়ে বেশী ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মদন দাসের।

বেতাল বলল কেন?

রাজা বললেন, অনঙ্গমঞ্জরী পরপুরুষকে ভালবেসে তাকে সময়ে না পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করল। কমলাকরও একই কারণে প্রাণত্যাগ করল। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি মদনদাসের ভালবাসা এমনই গভীর ছিল যে সে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত জেনেও তার জন্য প্রাণত্যাগ করল

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ ছেড়ে গাছে গিয়ে ঝুলল। রাজাও আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ হাঁটতে লাগলেন।

বেতাল তখন তার একবিংশতি গল্প আরম্ভ করল।

একবিংশতি কাহিনী

সেকালে জয়স্থল নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। বিষ্ণুশর্মার চার ছেলে ছিল।

বিষ্ণুশর্মা যেমন ধার্মিক ছিল্ল তার ছেলেরা ছিল ঠিক তেমনি তার উল্টো। তার বড় ছেলে ছিল জুয়াড়ী, মেজ ছেলে চরিত্রহীন, সেজটি ছিল নির্লজ্জ বেহায়া আর ছোট ছেলে নাস্তিক।

হঠাৎ বিষ্ণুশর্মা ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই মারা গেলেন। তাঁদের অপদার্থ চার ছেলেই অনাথ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তাদের আত্মীয় জ্ঞাতিরা তাদের সব বিষয় সম্পত্তি আত্মস্মাৎ করে নিল।

তখন চার. ভাই সহায় সম্বলহীন হয়ে যুক্তি করে তাদের মামার বাড়ি যজ্ঞস্থলে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তারা কুস্বভাব ত্যাগ করে চার ভাই বেদপাঠ ও পড়াশুনো করতে লাগল।

প্রথম প্রথম মামারা তাদের ভালবেসে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিল। পরে তাদের অবজ্ঞা করতে লাগল। তারা কোন রোজগার করত না বলে মামারা আর বেশীদিন পুষতে চাইল না।

এই সব দেখে শুনে বড় ভাইএর দুঃখ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। সে

একদিন তার তিন ভাইকে ডেকে বলল, ঘুরতে ঘুরতে শ্মশানে গিয়ে এক মৃত ব্যক্তিকে দেখে আমার মনে হলো একমাত্র মৃত্যুতেই আমি জীবনের যত সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তি লাভ করতে পারি। তাই আত্মহত্যা করার মানসে আমি একটি গাছে উঠে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লাম। কিন্তু ফাঁসটা ভাল লাগল না। দড়ি ছিঁড়ে আমি নিচে পড়ে গেলাম। একজন সহৃদয় লোক আমাকে দেখে আমার সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। তখন বুঝলাম অদৃষ্টে না থাকলে আত্মহত্যাও করা যায় না।

লোকটি তখন আমায় বোঝাল, আত্মহত্যা করলে নরকে গিয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আমি তাই আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে কঠোর তপস্যা করার সংকল্প করলাম।

তখন তা শুনে তিন ভাই বলল, আমরা আর সম্পদ লাভ করতে চাইব না। ধনসম্পদ নারীর মত চঞ্চলা অসার। আমরা দেশে দেশে ঘুরে এক একটি দিব্য বিদ্যা অর্জন করে এসে এক জায়গায় নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হব।

এরপর চার ভাই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চার দিকে বেরিয়ে পড়ল।

অবশেষে কিছুকাল পর এক নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হলো তারা। তারপর কে কি বিদ্যা শিখেছে তা সবাই বলল একে একে।

এক ভাই বলল, কোন মৃত লোকের হাড় পেলে আমি তাতে মাংস গজিয়ে দিতে পারি। দ্বিতীয় জন বলল, আমি তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিতে পারি। আর একজন বলল, আমি তার অন্যান্য অঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিতে পারি।

তখন চতুর্থ ভাই বলল, আমি তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি।

এর পর তারা তাদের আপন আপন বিদ্যার পরিচয় দিতে চাইল।

তখন বনের মাঝে খুঁজতে খুঁজতে এক মৃত সিংহের হাড় দেখতে পেল।

এক ভাই তখন সেই হাড়গুলো জড়ো করে তাতে মাংস গজিয়ে দিল। এক ভাই তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিল। এক ভাই অন্যান্য অঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিল। তখন চতুর্থ ভাই তার বিদ্যা জাহির করার জন্য সেই সিংহের দেহে প্রাণ সঞ্চার করল।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহ গর্জন করতে করতে কেশর ফুলিয়ে চার ভাইএর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়ে ফেলল তাদের।

এর থেকে বোঝা যায় ভাগ্য ভাল না হলে অর্জিত বিদ্যাও সুফল দান না করে ধ্বংস ডেকে আনে।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, সিংহের হাতে তাদের মৃত্যুর জন্য চার ভাই এর মধ্যে কে দায়ী?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন যে ভাই সিংহের দেহে প্রাণদান করেছে সেই দায়ী। কারণ অন্যান্য ভাইরা আপন আপন বিদ্যার দ্বারা সিংহের দেহটিকে গঠন করেছিল। কিন্তু যে তাকে প্রাণদান করেছিল তার পরিণাম চিন্তা করা উচিত ছিল। তার বোঝা উচিত ছিল প্রাণ পেয়ে সিংহ অবশ্যই তাদের খাবে।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন আবার।

বেতাল এবার দ্বাবিংশ গল্প শুরু করল।

দ্বাবিংশ কাহিনী

বিশ্বপুর গ্রামে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বার্ধক্যের জন্য তাঁর দেহ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে ক্রমশঃ। ইন্দ্রিয়শক্তি বিকল হয়ে ওঠে।

যৌবনে যখন দেহে শক্তি ছিল তাঁর, তখন কোন ভোগবাসনা ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দেহ অশক্ত হয়ে উঠলে ভোগবাসনা জাগতে থাকে তাঁর মনে।

তিনি তখন একদিন ভাবলেন, আমি পরদেহধারণবিদ্যা জানি। এই বিদ্যার দ্বারা আমি এই বার্ধক্যজর্জরিত দেহ ত্যাগ করে এক যুবকের দেহ ধারণ করে ইচ্ছামত সুখ ভোগ করতে পারি। কিন্তু এর জন্য সংসার ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে হবে আমায়।

মনে মনে এই সংকল্প করে নারায়ণ স্ত্রী পুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সংসার ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। তিনি বলে গেলেন, জীবনের বাকি দিনগুলো বনে গিয়ে যোগসাধনা করে কাটাবেন।

বনে গিয়ে তাঁর বিদ্যার দ্বারা নিজদেহ ত্যাগ করে এক যুবকের দেহ ধারণ করলেন। তখন ইচ্ছামত ভোগ করে যেতে লাগলেন।

বেতাল বলল, মহারাজ, নিজদেহ ত্যাগ করার সময় ব্রাহ্মণ কেঁদেছিল এবং যুবকের দেহ ধারণ করে হেসেছিল। এর কারণ কি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ব্রাহ্মণের কাঁদার কারণ হলো নিজের দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল আত্মীয়দের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর হাসার কারণ হলো যুবকের দেহ ধারণ করে ইচ্ছামত ভোগসুখ করতে পারবেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে আবার ধরে এনে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার ত্রয়োবিংশ কাহিনী বলতে শুরু করল।

ত্রয়োবিংশ কাহিনী

সেকালে ধর্মপুর নগরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার দুটি ছেলে ছিল। কিন্তু দুটি ছেলে ছিল দু রকমের। এক ছেলে ছিল ভোজন-বিলাসী অর্থাৎ ভাল খাওয়ার প্রতি অসাধারণ লোভ ও লালসা ছিল তার। আর একটি ছেলে ছিল শয্যাবিলাসী অর্থাৎ শুধু আরামদায়ক শয্যার প্রতি তার লোভ ছিল।

দুই ভাইএর দু বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতার কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে রাজার কানে গিয়ে উঠল কথাটা। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রাজা তাদের ডেকে পাঠালেন রাজসভায়। কার কি বিষয়ে কেমন ক্ষমতা আছে তা জানতে চাইলেন।

রাজা প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি রাজ-বাড়ির প্রধান রাঁধুনিকে ডেকে যত রকমের ভাল খাবার হতে পারে তা সব রাঁধতে বললেন।

রাজার আদেশে রাঁধুনি তার যত রকমের ভাল খাবার জানা ছিল তা সে সব তৈরি করে রাজাকে জানাল।

রাজা নিজে ভোজনবিলাসীকে সঙ্গে করে ভোজনাগারে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কিছু আহার করতে বললেন। তাকে বসিয়ে দিয়ে রাজা তাঁর জায়গায় ফিরে এলেন। ভোজনবিলাসী আহার করতে শুরু করল।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কিছু না খেয়েই রাজার কাছে চলে এল।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছ ত?

ভোজনবিলাসী বলল, না মহারাজ। আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হলো না।

রাজা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

সে বলল, মহারাজ, খেতে গিয়ে দেখি ভাতে শবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে শ্মশানের কাছে কোন জমির ধান থেকে ঐ ভাতের চাল তৈরি হয়েছে।

রাজা প্রথমে হেসে কথাটাকে পাগলের প্রলাপ হিসাবে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। পরে তিনি চালের ভাণ্ডারিকে ডেকে ব্যাপারটা ঠিক কি না খোঁজ নিয়ে দেখতে বললেন।

ভাণ্ডারি খোঁজ খবর নিয়ে এসে রাজাকে জানাল, মহারাজ নগর বাইরে যে শ্মশান আছে তার পাশের ক্ষেতের ধান থেকে ঐ চাল তৈরি হয়েছে।

রাজা খুশি হযে ভোজনবিলাসীকে বললেন, তুমি সত্যিই প্রকৃত ভোজন-বিলাসী

এর পব রাজা একটি শয়নঘরে দুধের মত সাদা এক নরম শয্যায় শয্যা-বিলাসীকে নিয়ে গিয়ে তাকে শুতে বললেন।

কিন্তু সে একবার শুয়েই উঠে পড়ল। তারপর রাজার কাছে চলে গেল।

রাজা আশ্চর্য হযে তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয্যাবিলাসী বলল, মহারাজ, ঐ শয্যার সপ্তম তলায় একটি চুল আছে। তাই আমার শোয়া হলো না। বড অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নিজে গিয়ে শয্যাটি একে একে তুলে দেখলেন, সত্যিই তার সপ্তমগুলে একটি চুল রয়েছে।

রাজা খুশি হয়ে বললেন, তুমি প্রকৃতই শয্যাবিলাসী।

রাজা দুই ভাইকেই প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, মহারাজ ! এই দুই ভাইএর মধ্যে কে বেশী প্রশংসার যোগ্য ?

রাজা বললেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাছ থেকে গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাঁধে তুলে আবার যাত্রা শুরু করলেন।

বেতালও এবার চতুর্বিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

চতুর্বিংশ কাহিনী

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় মনে বড় দুঃখ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে দেবতার কাছে অনেক কাতর প্রার্থনা করার পর অবশেষে এক পুত্রলাভ করেন তিনি।

পুত্রটি ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। ক্রমে সব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে সে। পিতামাতার প্রতি তার ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। কিন্তু বিদ্বান ও গুণবাণ এই পুত্রটি মাত্র আঠারো বছর বয়সে অকালে মারা যায়।

পুত্রশোকে মর্মাহত ও মৃতপ্রায় হয়ে উঠল বাবা মা। সৎকারের জন্য মৃতদেহ শ্মশানে এনে চিতা সাজানো হলো।

সেই শ্মশানে এক বৃদ্ধ যোগী দীর্ঘকাল ধরে যোগসাধনা করেছিল। সেই যোগী আঠারো বছরের ঐ মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে দেখে ভাবল, আমার এই দেহ বার্ধক্যে জীর্ণ ও শীর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অশক্ত দুর্বল দেহ দিয়ে কোন ভাল কাজই হবে না। আমি যদি যোগশক্তিবলে ঐ ব্রাহ্মণকুমারের দেহে প্রবেশ করি তাহলে অনেকদিন যোগসাধনা করতে পারব।

মনে মনে এই সংকল্প করে যোগী মৃত ব্রাহ্মণকুমারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞশর্মার মৃত পুত্র প্রাণ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল। যজ্ঞশর্মা পুত্রকে ফিরে পেয়ে প্রথমে আনন্দে হাসতে লাগলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদে মুখভার করে কাঁদতে লাগলেন।

বেতাল এখানেই গল্প শেষ করে রাজাকে প্রশ্ন করল, যজ্ঞশর্মা পুত্রকে ফিরে পেয়ে প্রথমে হাসলেন কেন এবং পরে আবার কাঁদলেনই বা কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মৃত বা হারানো পুত্রকে ফিরে পেয়ে সব বাবাই আনন্দিত হয়। তাই যজ্ঞশর্মাও আনন্দে হেসেছিলেন। কিন্তু তিনি পরদেহ প্রবেশনীবিদ্যা জানতেন বলে তিনি পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, তাঁর পুত্র আসলে পুনর্জীবন লাভ করেনি। যোগীর যোগসাধনা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই কথা জানতে পেরে কাঁদলেন তিনি।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজাকে ছেড়ে গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। কিন্তু রাজা আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও তার পঞ্চবিংশ গল্প আরম্ভ করল।

পঞ্চবিংশ কাহিনী

দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নামে এক নগরে মহাবল নামে এক মহা পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করতেন।

একবার আরো শক্তিশালী এক রাজা বহু সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করল। রাজা মহাবলও তখন বাধ্য হয়ে তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তখন ভাগ্য ভাল না থাকায় বিদেশী রাজার কাছে পরাজিত হলেন মহাবল। তাঁর প্রায় সব সৈন্য বিনষ্ট হলো।

রাজা মহাবল দেখলেন শক্রসৈন্যরা এখনি প্রাসাদে এসে তাকে বন্দী অথবা বধ করবে। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকেও বন্দিনী করে নিয়ে যাবে। তাই মহাবল স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাসাদের গোপন দরজা দিয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

নগর বাইরে এক দূর বনে চলে গেলেন মহাবল। অনেক পথ হাঁটার পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁরা তিনজনেই কাতর হয়ে উঠলেন।

এদিকে দিন শেষ হয়ে আসছিল তখন। সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরি নেই। মহাবল তখন একটি গাছের তলায় স্ত্রী ও কন্যাকে বসিয়ে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু দিনের আলো নিবে গেলেও ফিরে এলেন না রাজা মহাবল। রাজাকে ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। একই সঙ্গে রাজা ও নিজেদের অনিষ্টের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল তারা।

সেদিন কুণ্ডিলের রাজা চন্দ্রসেন তাঁর বড ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন সেই বনে। বিকালে তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে পায়ের ছাপ দেখে বনের সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে রাজা মহাবলের স্ত্রী ও কন্যা এক গাছের তলায় বসে ছিল।

রাজা চন্দ্রসেন ও তাঁর পুত্র সেখানে গিয়ে দেখলেন, পরমাসুন্দরী দুটি নারী গাছতলায় বসে কাঁদছে।

চন্দ্রসেন তখন রাণী ও রাজকন্যাকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তিনি নিজেও দুঃখিত হলেন। পরে সসম্মানে তাদের তাঁরা রাজধানীতে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে।

কিছুদিন পর মহাবলের কোন খোঁজখবর না পেয়ে রাজা চন্দ্রসেন রাজকন্যাকে এবং তাঁর পুত্র রাণীকে বিয়ে করলেন।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল প্রশ্ন করল, এই দুজনের যখন সন্তান হবে তখন তাদের কি সম্বন্ধ হবে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক ভেবেও বেতালের এই প্রশ্নে কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তিনি নীরবে পথ চলতে লাগলেন বেতালকে নিয়ে।

রাজা তার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় বেতাল ভাবল, আমি এবার জিতেছি। এই অসমসাহসী বীরপুরুষকে আর আমি ছলনা করব না। বরং ঐ দুর্বৃত্ত সন্ন্যাসীকে কৌশলে বঞ্চিত করব আমি। যে দিব্যপদ লাভ করতে চায় সন্ন্যাসী তা রাজাকেই দান করব।

এই ভেবে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, শোন রাজা, তুমি আমার জন্য শ্মশানে অনেকবার আনাগোনা করে অনেক কষ্ট করেছ। তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। আমি এখনি এই শব ছেড়ে চলে যাব। তুমি এই শবটাকে বয়ে নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী তখন আমাকে আবার আহ্বান জানিয়ে পূজা করবে। পূজার পর সে তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে বলবে। কিন্তু তুমি প্রণাম করবে না। তুমি প্রণামের জন্য মাথা নত করলেই সে খড়্গ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে। তুমি বলবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কি করে করতে হয় জানি না। আপনি শিখিয়ে দিন। সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেখাতে গেলেই তুমি খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলবে। তাহলে তার লভ্য বিদ্যাধরদের রাজপদ তুমিই লাভ করবে। আমার সব কথা মেনে চলবে। তা না হলে সে তোমায় বলি দেবে। তোমার এই বিপদ ঠেকিয়ে রাখার জন্যই আমি গল্প বলে সময় কাটিয়েছি। তোমাকে যেতে বাধা দিয়েছি।

এই কথা বলে শব ছেড়ে চলে গেল বেতাল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবার বুঝতে পারলেন সন্ন্যাসী তাঁর শত্রু। তবু তিনি বেতালের কথামত শবটাকে সেই শ্মশানে সন্ন্যাসীর সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

রাজা দেখলেন হলুদ রঙের অস্থিচূর্ণ দিয়ে এক বৃত্ত আঁকা। সেই বৃত্তের মাঝে রক্তভরা এক কলস। মরা মানুষের চর্বি দিয়ে এক প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। হোমের আগুন জ্বলছে। বলির নানা উপকরণ রয়েছে। সন্ন্যাসী পূজা করছে।

রাজাকে দেখে খুশি হয়ে সন্ন্যাসী তাঁর অনেক গুণগান করল। বলল, মহৎ লোকেরা নিজের জীবন দিয়েও মানুষের উপকার করে। প্রতিশ্রুত কাজ ঠিক করে।

এই বলে সন্ন্যাসী শবটাকে রাজার কাঁধ থেকে নামিয়ে সেই বৃত্তের মাঝখানে রাখল। তারপর শবটাকে গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে তার গলায় মালা পরিয়ে চামড়া দিয়ে তৈরি একটা উপবীত পরিয়ে দিল তার গলায়।

এর পর সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর মন্ত্র পড়ে বেতালকে আহ্বান করল। বেতালকে সে শবের মধ্যে ঢুকিয়ে ফুল ও নরমাংস দিয়ে তার ভোগ দিল।

তারপর সন্ন্যাসী রাজাকে বলল, মহারাজ, মায়াধিপতি বেতাল এসে গেছে। আপনি তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করুন।

বেতালের কথাটা এবার মনে পড়ে গেল রাজার। রাজা বললেন, আপনি দেখিয়ে দিন প্রভু। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কিভাবে করতে হয় আমি তা জানি না।

সন্ন্যাসী তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জন্য শুয়ে পড়তেই রাজা তাঁর তরবারি দিয়ে সন্ন্যাসীর মাথাটা কেটে ফেললেন এক কোপে। তারপর সন্ন্যাসীর হৃৎ-পিণ্ডটা বার করে তার ছিন্নমুণ্ডের সঙ্গে উপহার দিলেন বেতালকে।

সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের ভূতপ্রেতরা জয়ধ্বনি করতে লাগল রাজার। বেতাল রাজাকে বর চাইতে বলল।

রাজা বললেন, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছ এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। তবু যদি একান্তই বর দিতে চাও তাহলে যে পঁচিশটি গল্প তুমি আমায় বলেছ তা যেন চিরকাল প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে সারা দেশে।

বেতাল বলল, 'তথাস্তু'। এই গল্পগুলির নাম হবে বেতাল পঞ্চবিংশতি। যেখানে এই সব গল্প পড়া হবে সেখানে যক্ষ, বেতাল, ডাকিনী, যোগিনী বা রাক্ষসদের কোন উপদ্রব থাকবে না।

এই বলে বেতাল শব ছেড়ে চলে গেল।

এবার স্বয়ং শিব রাজার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভণ্ড সন্ন্যাসীকে বধ করার জন্য বাহবা দিচ্ছি তোমায়। পৃথিবীতে রাজত্ব করার পর স্বর্গে গিয়ে তুমি বিদ্যাধরদের রাজা হবে। আগে তোমাকেই আমি আমার অংশে সৃষ্টি করেছিলাম অসুর নিধনের জন্য। তোমাকেই আবার দুষ্কৃতকারীকে বধ করার জন্য ত্রিবিক্রম নামে সৃষ্টি করেছি। এই দিব্য খড়্গের দ্বারাই তুমি সারা পৃথিবী জয় করতে পারবে।

এই বলে শিব রাজাকে সেই দিব্য খড়্গ দান করলেন। তারপর অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

রাজা তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালে তিনি দেখলেন গতরাতের তাঁর দুঃসাহসিক কাজের কথা নগরবাসীরা জেনে গেছে।

নগরবাসীরা তাঁকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা জানাল। রাজা প্রাণ ভরে শিবের পূজা করলেন। তারপর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য শিবদত্ত সেই দিব্য খড়্গের সাহায্যে একে একে সমগ্র দ্বীপাবলী ও পাতালসহ সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হয়ে ওঠেন। শেষে বিদ্যাধরদের রাজপদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল ভোগসুখের পর তাঁর জীবনের মূল উৎস শিবের দেহের মধ্যে গিয়ে মিলিয়ে যান তিনি।

বত্রিশ সিংহাসন

প্রজাপালক হিসাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মন জয় করেন বিক্রমাদিত্য। তার মত উদার ও দানশীল রাজা সেকালে দেখাই যেত না। তাঁর মহত্ত্বের কথা লোকমুখে প্রচারিত হত দেশে বিদেশে।

একদিন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, সর্পভূষণ মহাদেব ও বরাহবেশী বিষ্ণু আপনাকে আরও ঐশ্বর্যশালী করে তুলুন।

তারপর সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন আমি মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রে হোম করব। আপনাকে সেখানে উত্তরসাধকরূপে উপস্থিত থাকতে হবে।

রাজা তাতে সম্মত হলে বেতাল সন্তুষ্ট হলো। রাজা অষ্টসিদ্ধি লাভ করলেন। সারা ত্রিভুবনে বিক্রমাদিত্যের খ্যাতি ও কীর্তির কথা অব্যাহত ভাবে প্রচারিত হতে লাগল।

এই সময় একদিন দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশী ও রম্ভাকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে নৃত্যগীতে যে বেশ পটু তাকে বিশ্বামিত্রের তপোবনে গিয়ে তার তপোভঙ্গ করতে হবে। যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেব।

দুজন অপ্সরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানাল। তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য দেবতাদের এক সভা ডাকা হলো।

প্রথম দিন রম্ভা ও দ্বিতীয় দিনে উর্বশী নৃত্য করল। দেবতারা তাদের নৃত্য দেখে সন্তুষ্ট হলেন সকলে। কিন্তু কারো নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠত্ব ঠিকমত বিচার করা হলো না।

তখন দেবর্ষি নারদ বললেন, পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন। তিনি সকল বিদ্যায় বিশেষ করে নৃত্য ও গীতবিদ্যায় পারদর্শী। তিনিই এর মীমাংসা করতে পারবেন।

নারদের কথা শুনে দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আনার জন্য মাতলিকে পাঠালেন উজ্জয়িনী নগরে।

দেবরাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেবলোকে এসে উপস্থিত হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। আবার নৃত্যগীতের আসর বসল। প্রথম দিন রম্ভা ও দ্বিতীয় দিন উর্বশী তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করল।

বিক্রমাদিত্য বিচার করে উর্বশীকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন।

উর্বশীকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হলো তা জানতে চাইলেন দেবরাজ।

বিক্রমাদিত্য বললেন, নৃত্যকলায় অঙ্গসৌষ্ঠবই শ্রেষ্ঠ। তাতে উচ্চ ও নীচভাবে অঙ্গচালনার সঙ্গে চলবে পদচালনা। কটি, জানু, বক্ষ, মস্তক, অক্ষি-যুগল ও কর্ণ সমান ভাবে সঞ্চালিত হবে। বাকি অংশগুলির মনোহারিতা ও বক্ষস্থলের যথাযথ উন্নতিই হলো নৃত্যবিচারের প্রধান বিষয়।

নৃত্য সম্বন্ধে রাজা বিক্রমাদিত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলেন দেবরাজ। তাঁকে মহেন্দ্র বস্ত্র দান করে সম্মানিত করলেন। সেই সঙ্গে একটি রত্নখচিত সিংহাসনও উপহার হিসাবে দান করলেন রাজাকে। সেই সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খচিত ছিল। তাদের মাথার উপর পা দিয়ে সে সিংহাসনে বসতে হয়।

সেই সিংহাসনটি যত্নসহকারে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এসে শুভ দিনে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করে তাতে বসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন বিক্রমাদিত্য।

এই ঘটনার বহু বছর পরে প্রতিষ্ঠা নগরে রাজা শেষনারের ঔরসে আড়াই বছর বয়সের কন্যার গর্ভে শালিবাহনেব জন্ম হলেসারা দেশে ভূমিকম্প, ধূমকেতুর আবির্ভাব, দিগদাহ প্রভৃতি অশুভ ও অমঙ্গলসূচক ঘটনা ঘটতে লাগল।

রাজ বিক্রমাদিত্য তখন দৈবজ্ঞদের ডেকে বললেন, রাজ্যে এই সব অমঙ্গল ঘটছে কেন? এর ফল কি এবং এর দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হবার সম্ভাবনা আছে?

দৈবজ্ঞগণ বললেন, ভূমিকম্প সন্ধ্যার সময় হলে তাতে রাজার অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। ধূমকেতু দেখা দিলে তা রাজার বিনাশের লক্ষণ। আর পীতবর্ণের দিগদাহ হলে তা রাজার পক্ষে ভয়াবহ।

বিক্রমাদিত্য বললেন, একবার ভগবান আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমাকে অমরত্বের বর দিতে চান। আমি তখন বলি, আড়াই বছর বয়সের কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। ভগবান আমায় সেই বরই দান করেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?

দৈবজ্ঞগণ বললেন, দৈবের বিধানে সব কিছুই সম্ভব। আমাদের চিন্তার বাইরে সে বিধান।

রাজা তখন বেতালকে বললেন, তুমি সারা দেশ খুঁজে দেখ কোথায় সে সন্তান জন্মেছে। তারপর আমাকে জানাও।

বেতাল চারদিকে খুঁজে অবশেষে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠা নগরে কুমোরের বাড়িতে একটি বালিকা ও এক শিশুকে খেলা করতে দেখল।

বেতাল বালিকাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা তুজনে কার কে হও ?

বালিকাটি বলল, এই শিশু আমার ছেলে ?

বেতাল তখন বালিকাকে বলল, তোমার বাবা কে ?

সে তখন একজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে দিল।

বেতাল ব্রাহ্মণকে বলল, এই মেয়েটি কে ?

ব্রাহ্মণ বলল, এই মেয়েটি আমার কন্যা এবং এই শিশুটি ওর ছেলে।

বেতাল তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি করে সম্ভব হলো ?

ব্রাহ্মণ বলল, নাগরাজের ঔরসে এই কন্যার গর্ভে এই শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির নাম শালিবাহন।

বেতাল তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সব কথা জানাল।

রাজা তখন একটি অস্ত্র হাতে নিয়ে তখনি প্রতিষ্ঠা নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর সেই অস্ত্র দিয়ে তিনি শালিবাহনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে শালিবাহন একটি লাঠি দিয়ে বিক্রমাদিত্যের মাথায় আঘাত করল। সেই আঘাতে বিক্রমাদিত্য শূন্যে উঠে প্রতিষ্ঠা নগর হতে উজ্জয়িনীতে গিয়ে পড়লেন। সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হলো।

রাজপত্নীগণ যখন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে স্বামীর অনুগামিনী হতে উদ্যত হলেন তখন অমাত্যগণ বললেন রাজা অপুত্রক। এখন আমাদের কর্তব্য কি ?

ভট্টি পরামর্শ দিলেন, রাজপত্নীদের কেউ গর্ভবতী আছেন কি না তা আগে দেখতে হবে।

তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল একজন রাণী সাত মাসের গর্ভবতী। মন্ত্রীরা তখন সেই গর্ভের অভিষেক করে নিজেরা রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। সিংহাসন শূন্যে রয়ে গেল।

একদিন রাজসভায় দৈববাণী হলো হে মন্ত্রীবৃন্দ, এই সিংহাসনে বসার মত যখন কোন রাজা নেই তখন এই সিংহাসনটি কোন পবিত্র জায়গায় রেখে দাও।

মন্ত্রীগণ তাই করলেন।

এই ঘটনার বহুদিন পর ভোজরাজ রাজা হলেন। বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রীরা সেই সিংহাসনটি মাঠের মধ্যে এক পতিত জায়গায় ফেলে দেন। সেটি মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়ে সেখানে এক উঁচু ঢিবি হয়। পরে এক ব্রাহ্মণ সেই

জায়গাটিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেন সেই উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে পাখি তাড়িয়ে ফসল রক্ষা করত ব্রাহ্মণ।

একদিন ভোজরাজ রাজকুমারদের সঙ্গে সেইদিকে গেলে ব্রাহ্মণ তাকে বলল, রে বাজন, আপনি এখানে আসায় আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আপনি যত খুশি এই জমির ফসল নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে ভোজরাজ সৈন্যদেব নিযে সেই ক্ষেতে প্রবেশ করলেন। সৈন্য ও অশ্বদের পদভরে সে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলো।

ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে বললেন, রাজা হয়ে আপনি এই ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলেন কেন '

ভোজরাজ তখন সৈন্যদের নিয়ে ক্ষেতের বাইরে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ আবার সেই উঁচু ঢিবিব উপর উঠে পাখি তাড়াতে লাগল। সে তখন বাজাকে বলল, হে বাজন, চলে যাচ্ছেন কেন ? এই ক্ষেতের ফসল ঘোড়াদের খেতে দিন। আপনি তা গ্রহণ করুন।

বাজা তখন সেই ক্ষেতে আমাব প্রবেশ করলে ব্রাহ্মণ সেই ঢিবি থেকে নেমে এসে আগের মত ফসলহানির জন্য ভৎ র্সনা কবতে লাগল।

ভোজবাজ তখন চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন ব্রাহ্মণ যখন ঢিবিব উপর থাকে তখন সে দানশীল হয়ে ওঠে আর তখন সেখান থেকে নেমে আসে তখন হীনবুদ্ধির উদয় হয় তার মধ্যে।

রাজা তাই এবার নিজে সেই ঢিবির উপর উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অপূর্ব এক উদারতার ভাব দেখা গেল। তাঁর মনে হলো, জগতের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা তাঁর কর্তব্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা তাঁর কর্তব্য।

রাজা তখন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে সেই ক্ষেত খনন করার আদেশ দিলেন।

রাজার লোকেরা জায়গাটির অনেকটা খুঁড়ে একটি শিলা দেখতে পেল। রাজাও সেখানে দাঁড়িযে দেখতে লাগলেন। সেই শিলার নীচে বত্রিশটি পুতুল-সহ রত্নখচিত এক সিংহাসন পাওয়া গেল।

সিংহাসন দেখে ভোজরাজ আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে সেটিকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সিংহাসনটিকে কিছুতেই ওঠাতে পারল না রাজার লোকেরা।

তখন রাজার মন্ত্রী বলল, যথাবিহিত বলি ও হোমসহ পূজা না দিলে এই দিব্য সিংহাসন উঠবে না।

রাজা তখন ব্রাহ্মণদের ডেকে যজ্ঞ ও পূজার অনুষ্ঠান করতে বললেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে চেষ্টা করতেই সিংহাসনটি হাল্কা হয়ে উঠে আসতে লাগল।

রাজা তখন মন্ত্রীর প্রশংসা করে বললেন, আপনার বুদ্ধিবলেই একাজ সম্ভব হলো।

মন্ত্রী বললেন, মন্ত্রীর অনেক গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন নন্দরাজার মন্ত্রী বহুশ্রুত একবার রাজার ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করেছিলেন।

ভোজরাজ বললেন, কি করে তা করেন?

মন্ত্রী বললেন, তাহলে শুনুন সে কাহিনী। বিশাল নগরীতে নন্দ নামে এক মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। নিজ বাহুবলে অনেক রাজাকে জয় করে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল বহুশ্রুত আর রাণীর নাম ছিল ভানুমতী।

রাণী ভানুমতী রাজার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিল। রাণীকে এক মুহূর্তও না দেখে থাকতে পারতেন না রাজা। তিনি যখন সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতেন তখন রাণীকে তাঁর কোলের উপর বসিয়ে রাখতেন।

এই সব দেখে মন্ত্রী একদিন রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমার একটি আবেদন আছে আপনার কাছে।

রাজা বললেন, বল।

মন্ত্রী বললেন, রাণীকে আপনি যেভাবে রাজসভায় বসিয়ে রাখেন শাস্ত্রকারদের মতে তা অনুচিত।

রাজা বললেন, তা জানি। কিন্তু কি করব? ভানুমতীকে আমি এত ভালবাসি যে তাকে ছেড়ে ক্ষণকাল থাকাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে এক কাজ করুন। এক চিত্রকরকে ডাকিয়ে এনে একখানি চিত্র আঁকিয়ে তা রাজসভার দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখুন।

রাজা তাতে রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরকে ডাকা হলো। রাজা তাকে বললেন, ভানুমতীর রূপ সঠিকভাবে চিত্রিত করে দাও। চিত্রের রূপ যেন তার যথাযথ প্রতিচ্ছবি হয়।

চিত্রকর তখন ভানুমতীকে একবার সামনাসামনি দেখতে চাইল।

রাজা ভানুমতাকে আনিয়ে দেখালেন চিত্রকরকে। চিত্রকর ভানুমতীর

মধ্যে পদ্মিনী নারীর লক্ষণ দেখতে পেল। তার অঙ্গ কোমল, তার অঙ্গগন্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মত। নয়ন চকিত হরিণীর মত।

রাজা চিত্রকরের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন চিত্রকরকে।

একদিন রাজগুরু শারদানন্দ এসে ভানুমতীর চিত্র দেখে চিত্রকরকে বললেন, তুমি ভানুমতীর দেহের সব লক্ষণগুলিই এঁকেছ। কিন্তু একটি ভুল থেকে গিয়েছে।

চিত্রকর বুঝতে না পেরে বলল, কি ভুল প্রভু বলুন।

শারদানন্দ বললেন, ভানুমতীর বাম জঘনস্থলে তিলের মত একটি মৎস্য-চিহ্ন আছে। সেটিকে বাদ দিয়েছ তুমি।

রাজা শারদানন্দের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য রাত্রিতে ভানুমতীর বাম জঘনস্থল পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখলেন শারদানন্দ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তিনি ভেবে পেলেন না ভানুমতীর দেহের এই গুপ্তস্থানের কথা শারদানন্দ জানলেন কি করে। তবে কি ভানুমতীর সঙ্গে কোন সময়ে অবৈধ সম্পর্ক ছিল শারদানন্দের?

রাজা মনে মনে এই সব কথা ভেবে মন্ত্রীকে ডেকে সব কথা বললেন।

মন্ত্রী বললেন, এসব সত্যও হতে পারে। কিছু বলা যায় না।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার প্রিয়পাত্র হও তাহলে শারদানন্দকে হত্যা করার ব্যবস্থা কর।

মন্ত্রী সকলের সামনেই বন্দী করলেন শারদানন্দকে।

রাজার আদেশে শারদানন্দকে বধ করার জন্য যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন শারদানন্দ একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন পথে। তার অর্থ হলো, মানুষ বলে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুর মধ্যে, জলের মধ্যে, সমুদ্রে বা পাহাড়ের চূড়ায় যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় থাকুক না কেন, তার পূর্বের কোন পুণ্য থাকলে সেই পুণ্য তাকে রক্ষা করে।

মন্ত্রী শারদানন্দের কাছেই ছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমি ব্রাহ্মণহত্যা করে পাপের ভাগী হই কেন? এ কাজ করা আমার ঠিক হবে না।

এই ভেবে তিনি শারদানন্দকে সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গোপনে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর রাজার কাছে গিয়ে বললেন, আপনার আদেশ পালন করা হয়েছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন রাজপুত্র জয়পাল মৃগয়া করার জন্য

বনে গেল। তখন কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। তা দেখে মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিসাগর বলল, রাজকুমার, আজ মৃগয়ায় গিয়ে কাজ নেই। চারদিকে অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

রাজকুমার বলল, এসব কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না।

মন্ত্রীপুত্র তাকে অনেক করে বোঝালেও তা শুনল না রাজকুমার। সে মৃগয়ায় চলে গেল।

মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে বলল, তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তোমার বিনাশ-কাল উপস্থিত। স্বর্ণমৃগের লোভে রামচন্দ্রেরও এমনি একদিন বুদ্ধিনাশ হয়েছিল।

এদিকে রাজকুমার বনে গিয়ে অনেক হিংস্র জন্তু বধ করার পর একটি কালো হরিণের পিছু ধাওয়া করে গভীর বনে প্রবেশ করল। হঠাৎ দেখল সেই হরিণটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কোন সৈন্য বা অনুচর নেই।

যাই হোক, রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল। গিয়ে একটি সরোবর দেখতে পেল।

সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে একটি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বেঁধে গাছের নিচে ক্লান্ত হয়ে বসল। এমন সময় সেখানে একটি বাঘ এসে পড়লে ঘোড়াটি বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

রাজপুত্রও ভয় পেয়ে সেই গাছের উপর উঠে গেল। বাঘটা গাছের নিচে বসে রইল। সেই গাছে একটা ভালুক ছিল।

ভালুক রাজকুমারকে বলল, তুমি আমার অতিথি। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এখানে থাক। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। বাঘও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ভালুকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে খুশি হলো রাজপুত্র। বাঘটি তেমনি গাছতলায় বসে রইল।

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার নেমে এল বনে। ক্লান্ত রাজ-পুত্রের চোখে ঘুম নেমে এল। সে বসে থাকতে পারছিল না।

ভালুক বলল, গাছ থেকে পড়ে গেলে তোমার বিপদ হবে। তুমি বরং আমার কোলে ঘুমোও।

রাজপুত্র ভালুকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাঘ তখন ভালুককে বলল, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। আজ তুমি যার জীবন

রক্ষা করছ পরে সে কোনদিন শিকার করতে এসে আমাদের বধ করবে। ও আমাদের শত্রু। সুতরাং ওকে তুমি ফেলে দাও গাছ থেকে।

ভালুক বলল, ওর চরিত্র যাই হোক, ও এখন আমার শরণাগত। ওকে রক্ষা করা আমার পবিত্র কর্তব্য।

রাজপুত্রের একসময় ঘুম ভাঙ্গলে ভালুক বলল, এবার বোধহয় তোমার ক্লান্তি দূর হয়েছে। এবার তুমি জেগে থাক, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

এই বলে ঘুমিয়ে পড়ল ভালুক।

বাঘ তখন রাজপুত্রকে বলল, রাজকুমার, ভালুককে বিশ্বাস করো না। নখই ওর অস্ত্র। শাস্ত্রে বলে যাদের নখ, শিং অথবা হাতে অস্ত্র আছে তাদের বিশ্বাস করতে নেই। এই ভালুক আমার হাত থেকে রক্ষা করে তোমাকে খাবে। সুতরাং এই সুযোগে তুমি ওকে ফেলে দাও। ওকে খেয়ে আমি চলে যাই। তুমি বাড়ি চলে যাও।

রাজপুত্রের মনে হলো বাঘ ঠিকই বলেছে। তাই সে ঘুমন্ত ভালুককে ঠেলে গাছ থেকে ফেলে দিল। কিন্তু পড়তে পড়তে গাছের একটা ডাল ধরে বেঁচে গেল ভালুক।

রাজপুত্র এবার ভয় পেয়ে গেল। একূল ওকূল দুদিকই গেল তার।

ভালুক তখন তাকে বলল, পাপিষ্ঠ, ভয় পাচ্ছ কেন? যেমন কর্ম করেছ তার ফল তোমায় ভোগ করতেই হবে। এখন থেকে তোমাকে পিশাচরূপ লাভ করে 'সসেমিরা' এই কথা অনবরত বলে বলে বেড়াতে হবে।

ক্রমে রাত্রি ভোর হয়ে গেলে বাঘ সেখান থেকে চলে গেল। ভালুক অভিশাপ দেবার পর চলে গেল সেই গাছ থেকে।

এদিকে রাজপুত্রও পিশাচ হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগল আর মুখে 'সসেমিরা' এই কথাটা বলে যেতে লাগল।

রাজপুত্রের শূন্য ঘোড়াটি রাজধানীতে ফিরে গেলে রাজার লোকেরা রাজাকে জানাল।

রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, কুমার যখন মৃগয়া করতে যায় তখন অনেক কুলক্ষণ দেখা যায়। তবু সে কিছু গ্রাহ্য করেনি। সে নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। আমি এখনি বনে তার খোঁজে যাব।

মন্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

রাজা তাঁর অনুচরদের নিয়ে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলেন রাজপুত্র পিশাচ হয়ে 'সসেমিরা' বলতে বলতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজপুত্রকে তখন সঙ্গে করে প্রাসাদে নিয়ে এসে রাজা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হলো না।

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, এই সময় শারদানন্দ থাকলে তিনি রাজপুত্রকে ঠিক সুস্থ করে তুলতে পারতেন। আমি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ভুল করেছি।

মন্ত্রী বললেন, এখন তাহলে কি করতে চান?

রাজা বললেন, রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হোক যে ব্যক্তি আমার কুমারের রোগ সারিয়ে তাকে ভাল করে তুলতে পারবে, তাকে আমি অর্ধেক রাজত্ব দান করব।

মন্ত্রী তখন বাড়িতে গিয়ে শারদানন্দকে রাজার কথা সব বললেন।

শারদানন্দ মন্ত্রীকে বললেন, আপনি রাজাকে গিয়ে বলুন, আমার একটি কন্যা আছে। রাজা এই বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সে কুমারের আরোগ্যলাভের উপায় বলে দেবে।

মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে এই কথা বললেন।

রাজা সভাসদদের সঙ্গে মন্ত্রীদের বাড়িতে এলেন। রাজপুত্রও 'সসেমিরা' বলতে বলতে তাঁদের সঙ্গে এল।

কিন্তু মন্ত্রীকন্যা দেখা দিল না সামনে এসে। মন্ত্রী বলল, সে যা বলবে পর্দার আড়াল থেকেই বলবে।

এদিকে শারদানন্দই পাশের ঘরের মধ্যে পর্দার আড়াল থেকে মন্ত্রীকন্যার নামে একটি শ্লোক আবৃত্ত করলেন। এই শ্লোকটির প্রথমে ছিল 'সদ্ভাব' এই শব্দটি। শ্লোকটির অর্থ হলো যে সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত তাকে বঞ্চনা করার মধ্যে কোন নৈপুণ্য বা কৃতিত্ব নেই। কোলের মধ্যে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে থাকা শিশুকে বধ করার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই।

এই শ্লোকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসেমিরা' শব্দটি থেকে প্রথম বর্ণ 'স' বাদ দিয়ে কেবল 'সেমিরা' শব্দটি উচ্চারণ করতে লাগল।

তখন শারদানন্দ আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন যার প্রথম শব্দ ছিল 'সেতুং'। শ্লোকটির অর্থ হলো সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি কোথাও নেই।

এই শ্লোকটি শোনার পর রাজপুত্র 'সসে' বাদ দিয়ে শুধু 'মিরা' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল।

শারদানন্দ এবার তৃতীয় শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। এই শ্লোকের প্রথমে ছিল 'মিত্রদ্রোহী' শব্দটি। এই শ্লোকের অর্থ হলো পৃথিবীতে মহাপ্রলয় নেমে না আসা পর্যন্ত মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতকদের নরকভোগ করে যেতে হয়।

এই শ্লোক শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসেমি' বাদ দিয়ে শুধু 'রা' বলতে লাগল রাজপুত্র।

এর পর শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক আবৃত্তি করলেন। এই শ্লোকের প্রথমে ছিল 'রাজা' শব্দটি। এই শ্লোকের অর্থ ছিল, মহারাজ, আপনার পুত্রকে যদি সুস্থ করে তুলতে চান তাহলে ব্রাহ্মণদের দান আর দেবতাদের আরাধনা করুন।

চতুর্থ শ্লোকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র 'সসেমিরা' শব্দটি উচ্চারণ করা ছেড়ে দিল একেবারে। সে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মত হয়ে উঠল। সে তখন বনের মধ্যে সেদিন ভালুকের সঙ্গে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তা সব খুলে বলল।

রাজা তখন মন্ত্রীকন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, কুমারী, তুমি ত কোনদিন বনে যাওনি, তুমি কিকবে কুমারের এই সব বৃত্তান্ত জানলে ?

শারদানন্দ তখন পর্দার আড়াল থেকে বললেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কৃপায় আমার জিহ্বায় সব সময় সরস্বতী বাস করেন। তাই আমি সব কিছু জানতে পারি যেমন জেনেছিলাম ভানুমতীর অঙ্গের তিল।

রাজা এবার আশ্চর্য হয়ে পর্দা সরিয়ে শারদানন্দকে দেখতে পেলেন। রাজা তখন শারদানন্দকে প্রণাম করলেন।

রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে বলতে লাগলেন, এখন বুঝলাম সৎ সংসর্গে বাস করা সব মানুষের কর্তব্য। সৎ সংসর্গে বাস করলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আজ তোমার জন্যই আমার পুত্র রক্ষা পেল। রাজার উচিত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করা।

এইভাবে রাজা মন্ত্রীর অনেক গুনগান করে তাঁকে নানা দানে সন্তুষ্ট করলেন।

ভোজরাজের মন্ত্রী বহুশ্রুতের কাহিনী এখানেই শেষ হলো।

প্রথম উপাখ্যান

তখন ভোজরাজ তাঁর মন্ত্রীর প্রশংসা করে বস্ত্র ও রত্ন দিয়ে তাঁর সম্মান করে সিংহাসনটিকে নগরমধ্যে নিয়ে এলেন। একহাজার স্তম্ভবিশিষ্ট এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে সিংহাসনটিকে বসানো হলো।

এক শুভদিনে রাজা সেই সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য তার সামনে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করলেন রাজাকে। রাজা গরীব দুঃখীদের অনেক দান করলেন।

ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রথম পুতুলের মাথার উপর পা দিতেই পুতুল জীবন্ত কথা বলতে লাগল। সে বলল, মহারাজ, এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। বিক্রমাদিত্যের মত আপনার যদি সাহস, বীরত্ব ও উদারতা প্রভৃতি গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, যে সব গুণের কথা তুমি বললে সেই সব গুণই আমার আছে। আমি দান করেছি অনেক।

পুতুল বলল, আপনি নিজ মুখে নিজের গুণকীর্তন করছেন—এটাই ত আপনার একটা দোষ। সজ্জন ব্যক্তিরা কখনো নিজের গুণকীর্তন ও পরের নিন্দা করে না।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। নিজের প্রশংসা করে আমি ভুল করেছি। তুমি এই সিংহাসন যাঁর তাঁর উদারতার কথা বল।

পুতুল বলল, রাজা বিক্রমাদিত্য কেউ টাকার আশায় তাঁর কাছে এলেই তাকে এক হাজার মোহর দিতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে দশ হাজার এবং মহৎ লোককে এক লক্ষ মোহর দান করতেন। আবার কারো উপর বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হলে এক কোটি মোহর দান করতেন তাকে। আপনার যদি এই উদারতা থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য দ্বিতীয় পুতুলের মাথায় পা দিতেই পুতুলটি জীবন্ত হয়ে বলল, মহারাজ, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মত ধৈর্য থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, বিক্রমাদিত্যের ধৈর্য কিবকম ছিল তা বল।

পুতুল বলল, একবার রাজা বিক্রমাদিত্য চরদের বললেন, তোমরা দেশ-ভ্রমণে যাও। যেখানে যত আশ্চর্য বস্তু দেখবে আমাকে এসে বলবে। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তা দেখব।

চরেরা তখনি দেশভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল চারদিকে। কিছুদিন পর এক চর এসে বলল, মহারাজ, চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে এক তপোবনে এক দেবমন্দির আছে। সেখানে পাহাড় থেকে এক নির্মল জলের ধারা বেরিয়ে আসছে। সে জলে স্নান করলে সব পাপ দূর হয়ে যায়। সে জলে কোন মানুষ স্নান করলে পুণ্যবান হয়ে ওঠে। সেই দেবালয়ের কাছে এক ব্রাহ্মণ হোম করছেন। রোজ তিনি হোমকুণ্ডে আহুতি দেন। তারপর কুণ্ডের ধারে ছাই-এর গাদার সঙ্গে মিশে থাকেন। এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা আমি কখনো দেখিনি জীবনে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রাজা তখনি সেই চরের সঙ্গে চলে গেলেন চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে।

তিনি দেখলেন, জায়গাটি সত্যিই মনোরম। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, এ স্থান অতি পবিত্র। দেবী জগদম্বা বিরাজ করেন এখানে।

এর পর রাজা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার জলে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর সেই পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কত বছর এই মন্দিরে কাজ করছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন রেবতী নক্ষত্রে ছিল সেই সময় থেকে এই মন্দিরে হোম করে আসছি। সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থান করছে। এই কাজে আমার একশো বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তবু দেবতারা তুষ্ট হলেন না বা আমায় দেখা দিলেন না।

রাজা বিক্রমাদিত্য নিজে সেই হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন। তবু প্রসন্ন হলেন না দেবতা।

তখন বিক্রমাদিত্য দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে দেবী, আমি আমার এই মাথা তোমায় নিবেদন করলাম।

এই বলে তিনি খড়্গ ধরে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হতেই দেবী তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে হাত ধরে বললেন, রাজা, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। তুমি বর চাও।

রাজা তখন দেবীকে বললেন, হে দেবী, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরে এখানে হোম করছেন তবু তুমি কেন প্রসন্ন হচ্ছ না তাঁর উপর? আর আমার উপরেই বা এত শীঘ্র প্রসন্ন হলে কেন?

দেবী বললেন, এই ব্রাহ্মণ হোম ও পূজা করছে ঠিক, কিন্তু ওর তেমন কোন একাগ্রতা নেই। আঙুলের ডগা দিয়ে ব্যস্তভাবে যে জপ করা হয়, তাতে কোন ফল হয় না। দেবতা মাটি কাঠ বা পাথরের মূর্তির মধ্যে থাকে না, দেবতা থাকে মনের ভাবের মধ্যে। মন্ত্র, দেবতা ও ঔষধের উপর যার যেমন ভাবনা ও বিশ্বাস তার সেই রকমই সিদ্ধি হয়।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করো।

দেবী বললেন, তুমি পরোপকারী গাছের মত নিজে কষ্ট করে অন্যের পরিশ্রমের ফল পূর্ণ করছ। যে পরোপকার করে তার জীবন সার্থক হয়।

এইভাবে রাজার গুণগান করে দেবী ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। রাজাও তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

তার কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন ধৈর্য থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

স্থির হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

তৃতীয় উপাখ্যান

পরদিন রাজা আবার সিংহাসনে বসার জন্য তৃতীয় পুতুলের মাথায় পা দিতেই সেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বলল, আপনি যদি বিক্রমাদিত্যের মত আপন-পর ভেদ-জ্ঞান ত্যাগ করতে পারেন তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, তুমি সেই রাজার আপন-পর ভেদের কথা বল।

পুতুল বলল, বিক্রমাদিত্যের আপন-পর বলে কিছু ছিল না। সাহস, ধৈর্য ও উদ্যমে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

একদিন বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, এই সংসার অসার, জীবন অনিত্য। শাস্ত্রে বলে, উপার্জিত অর্থ ভোগ অথবা দান করতে হয়। আমি আমার অর্থ যথাসম্ভব সৎপাত্রে দান করব।

এই সব ভেবে বিক্রমাদিত্য সর্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। শিল্পীরা এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করল। রাজা চারদিকে লোক পাঠিয়ে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মুনি ঋষিদের নিমন্ত্রণ করলেন।

রাজার পক্ষ থেকে সমুদ্রকে নিমন্ত্রণ করার জন্য এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গিয়ে যোড়শোপচারে সমুদ্রের পূজা করে বলল, হে সমুদ্র, রাজা বিক্রমাদিত্যের আদেশে আমি তোমায় আহ্বান করতে এসেছি।

এই বলে সমুদ্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সেখানে বসে রইল ব্রাহ্মণ। কেউ কোন উত্তর না দেওয়ায় ব্রাহ্মণ উজ্জয়িনীতে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হতেই সমুদ্র এক সাধুর বেশে তার কাছে এসে বললেন, বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ করতে তোমাকে পাঠিয়েছে। এতে আমি সম্মানিত হলাম। বন্ধু দূরে থাকলেও তার প্রতি ভালবাসা কম হয় না। রাজা যে যজ্ঞ করতে চলেছেন তার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি চারটি রত্ন দিলাম। প্রথমটির সাহায্যে ধনরত্ন, দ্বিতীয়টির সাহায্যে খাদ্য, তৃতীয়টির সাহায্যে অশ্ব ও সৈন্য আর চতুর্থটির সাহায্যে অলঙ্কার পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ তখন রত্ন চারটি নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে রাজাকে তা দিলেন। তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য তাঁর সব ধনরত্ন দান করে দিয়েছেন। কিছুই অবশিষ্ট নেই। ব্রাহ্মণকে কি দেবেন তা ভেবে পেলেন না। তখন সমুদ্রদত্ত চারটি রত্নের মধ্যে যে কোন একটিকে খুশিমত বেছে নিতে বললেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ বলল, আমি বাড়ি গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করব কোনটা নেব।

ব্রাহ্মণ বাড়িতে গিয়ে রত্নগুলির গুণ বর্ণনা করল। তা শুনে তার ছেলে বলল, যে রত্ন দিয়ে সৈন্য পাওয়া যাবে সেইটাই নাও। তাহলে সৈন্যদের সাহায্যে রাজত্ব করা যাবে।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলল, যে রত্ন দিয়ে খাদ্য পাওয়া যাবে সেটাই নাও। কারণ খাদ্যের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে। মর্ত্যবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য বিধাতা যে অন্ন দিয়েছেন তার জন্যই প্রার্থনা করা উচিত।

পুত্রবধূ বলল, যে রত্ন দিয়ে অলঙ্কার পাওয়া যায় সেটা নিন। কারণ অলঙ্কারের দ্বারা দেবতাদের প্রীতি লাভ করা যায়।

ব্রাহ্মণ নিজে বলল, যে রত্ন দিয়ে ধন পাওয়া যায় সেইটাই নেওয়া উচিত। কারণ ধন থেকেই সব পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ এবার রাজার কাছে ফিরে এসে চারজনের চার মতের কথা বলল। রাজা তখন তাকে চারটি রত্নই দান করলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, দান করলেই দাতা হওয়া যায় না। আপনি যদি বিক্রমাদিত্যের মত এমন দাতা হন তাহলেই এ সিংহাসনে বসুন।

চতুর্থ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসার জন্য চতুর্থ পুতুলের মাথায় পা দিতেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বলল, মহারাজ আগে আমার একটি কাহিনী শুনুন।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন জ্ঞানী তেমনি গুণবান। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

এজন্য মনের দুঃখে দিন কাটত ব্রাহ্মণের। একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে মহাদেব বললেন, তুমি প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করো। তাহলে সন্তান হবে।

সকালে উঠে ব্রাহ্মণ গ্রামের বৃদ্ধদের বললেন স্বপ্নের কথাটা।

বৃদ্ধরা সকলে বলল, এ স্বপ্ন সত্য। তুমি প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করো। তোমার সন্তান হবে।

সকলের কথা শুনে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে শনিবারে প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন ব্রাহ্মণ। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রবর দান করলেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ পুত্রলাভ করে পুত্রের নাম রাখলেন দেবদত্ত।

যথাসময়ে ছেলের পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন ব্রাহ্মণ। কালক্রমে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল দেবদত্ত। দেবদত্তের বয়স যখন ষোল তখন তার বিয়ে দেওয়া হলো।

ছেলের বিয়ে দেবার পর ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে চলে গেলেন। যাবার সময় ছেলেকে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন। তিনি বলে গেলেন কখনো নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

সকলকে দয়া করবে। ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস রাখবে। সাধুদের সেবা করবে। নিজের আয় দেখে ব্যয় করবে। কুসঙ্গে মিশবে না কখনো এবং মেয়েদের কাছে কখনো গোপন কথা বলবে না। এই সব উপদেশগুলি মেনে চললে জীবনে শান্তি পাবে।

দেবদত্ত তার বাবার উপদেশমত দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গেল।

দেবদত্ত যখন বনের ভিতর কাঠ কাটছিল তখন রাজা বিক্রমাদিত্য শিকার করতে গিয়েছিলেন সেই বনে। তিনি তখন একটি শূয়োরের পিছনে ছুটতে ছুটতে সেই বনে এসে পড়েছিলেন। সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এমন সময় সহসা দেবদত্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। রাজা দেবদত্তকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করাতে দেবদত্ত নিজে রাজাকে সঙ্গে করে নগরে পৌঁছে দিল। খুশি হয়ে দেবদত্তকে এক মর্যাদাপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন রাজা।

রাজা তবু মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন, দেবদত্তের ঋণ কি করে আমি শোধ করব ?

দেবদত্ত ভাবল রাজার এই দুঃখটা সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এই ভেবে একদিন দেবদত্ত রাজার ছেলেকে চুরি করে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখল। তারপর রাজপুত্রের গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে তার চাকরকে দিয়ে স্যাকরার দোকানে বিক্রি করতে পাঠাল।

এদিকে রাজবাড়িতে রাজার ছেলেকে কোথাও পাওয়া গেল না। সারা নগরে একথা প্রচার হয়ে গেল। ছেলেকে খোঁজার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হলো।

রাজার লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে একটি স্যাকরার দোকানে দেখল দেবদত্তের চাকর রাজপুত্রের গয়না বিক্রি করছে সেই দোকানে। তারা তখন তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজার লোকেরা চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, এ গয়না পেলি কোথায় ?

চাকর বলল, দেবদত্ত এগুলো আমায় বিক্রি করতে পাঠিয়েছে।

রাজা তখন দেবদত্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবদত্ত, এই গয়না কে তোমায় দিল ?

দেবদত্ত বলল, কেউ দেয়নি। আমি টাকার লোভে কুমারকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বধ করে চাকরের হাত দিয়ে তার এই সব গয়না বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন।

তখন রাজপুরুষেরা বলল, মহারাজ এ শিশুহত্যা করেছে, তার উপর সোনা চুরি করেছে অতএব একে শতখণ্ড করে চিলকে দিয়ে খাওয়ানোর আদেশ দিন।

দেবদত্ত সর্বশাস্ত্রবিদ হয়েও একাজ কেন করল তা রাজসভার লোকেরা কেউ ভেবে পেল না।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, দেবদত্ত আমার আশ্রিত। তাছাড়া একদিন ও আমায় বনের মধ্যে পথ দেখিয়ে দিয়ে মহা উপকার করেছে। আশ্রিতের দোষ গুণ চিন্তা করা সৎ ব্যক্তির কর্তব্য নয়। উপকারীর প্রতি সদ্ব্যবহার সকলেই করে, কিন্তু অপকারীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করে সে-ই প্রকৃত সাধু।

রাজা এবার দেবদত্তকে বললেন, দেবদত্ত তুমি ভয় পাবে না। আমি আমার পূর্বের কর্মফলের জন্য ছেলেকে হারিয়েছি। আমি বুঝলাম উপকারী একবার উপকার করলে তার ঋণ কোনদিন শোধ করা যায় না।

এর পর রাজা বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি নানা উপহার দেবদত্তকে দিয়ে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিলেন।

দেবদত্ত তখন তার ঘরে গিয়ে রাজকুমারকে এনে রাজাকে দিল। রাজ-সভায় সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। রাজা বললেন এ কি ব্যাপার দেবদত্ত?

দেবদত্ত বলল, আগে আপনি প্রায়ই বলতেন আমার উপকারের ঋণ থেকে আপনি মুক্ত হতে পারছেন না। আপনার কথা সত্য কি না তা পরীক্ষা করার জন্যই এ কাজ করেছিলাম আমি। এখন দেখলাম সত্যিই আপনি জগতের উপকারী। আপনিই প্রকৃত সজ্জন। আপনার কৃতজ্ঞতার তুলনা হয় না।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, যদি আপনার এমন ঔদার্যগুণ ও কৃতজ্ঞতা গুণ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল বলল, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক রত্নবণিক একদিন এসে রাজাকে একটি মহামূল্যবান রত্ন উপহার দেয়।

রাজা তখন রত্নবিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে বললেন, এই রত্নটি পরীক্ষা করে এর মূল্য কত তা আমাকে জানাও।

পরীক্ষা করে রত্নকারেরা জানাল, মহারাজ, এটি এক অমূল্য রত্ন। কিন্তু এর সঠিক মূল্য না জেনে কিনলে মহা অনিষ্ট ঘটবে।

রাজা এবার রত্নবণিককে অনেক কিছু উপহার দিলেন এবং এই ধরনের আর রত্ন তার কাছে আছে কি না তা জানতে চাইলেন।

বণিক বলল, মহারাজ, এই ধরনের রত্ন বর্তমানে আমার কাছে নেই। আমার বাড়িতে এই রকম দশটি রত্ন আছে। প্রয়োজন হলে দাম দিয়ে তা নিতে পারেন।

রত্নপরীক্ষকরা একটি রত্ন পরীক্ষা করে দাম ঠিক করে বলল, একটি রত্নের দাম ছয় কোটি টাকা। এর পর রাজা হিসাব করে টাকা দিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোককে বণিকের সঙ্গে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আজ হতে আটদিনের মধ্যে রত্ন নিয়ে ফিরে এলে উপযুক্ত উপহার দেব।

লোকটি বলল, আট দিনের মধ্যে ফিরতে না পারলে আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

এই বলে সে রত্নবণিকের সঙ্গে তার বাড়ি চলে গেল।

বণিক তার বাড়িতে গিয়ে দশটি রত্ন রাজার লোকের হাতে দিয়ে দিল। লোকটি যখন বাড়ি ফিরছিল তখন পথে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো।

পথে একটি নদী ছিল। প্রবল বৃষ্টির জন্য প্লাবন দেখা দিল নদীতে। পারাপারের খেয়া বন্ধ।

রাজার লোকটি নাবিককে বলল, আমাকে নদী পার করিয়ে দাও।

নাবিক বলল, নদীতে এখন প্রবল স্রোত। এ অবস্থায় নৌকো চালানো বিপজ্জনক।

লোকটি বলল, আজ আমাকে রাজার কাছে যেতেই হবে। আমার

কাছে দশটি রত্ন আছে। সেই রত্ন নিয়ে আজ রাজার কাছে পৌঁছতে না পারলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে আমাকে।

নাবিক বলল, আমাকে যদি পাঁচটি রত্ন দাও তাহলে আমি কষ্ট করে তোমাকে নদী পার করে দিতে পারি।

কোন উপায় না দেখে লোকটি দশটি রত্নের মধ্যে পাঁচটি দিয়ে দিল নাবিককে।

লোকটি রাজার কাছে গিয়ে বাকি পাঁচটি রত্ন রাজাকে দিল।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বণিক কি তাহলে তোমাকে দশটি রত্ন দেয়নি?

লোকটি বলল, বণিক আমাকে দশটি রত্নই দিয়েছিল। কিন্তু ফেরার পথে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় নদীতে প্লাবন দেখা দেয়। নাবিক কিছুতেই নদী পার করছিল না। এদিকে আজকে আমি ফিরব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। তাই কোন উপায় না দেখে পাঁচটি রত্ন নাবিককে দিয়ে নদী পার হই।

রাজা লোকটির কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঐ পাঁচটি রত্নও দিয়ে দিলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি বলল, মহারাজ, আপনার যদি ঐ রূপ উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে একটি কাহিনী শুনুন।

একবার চৈত্রমাসে বসন্ত উৎসবকালে বিক্রমাদিত্য রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করার জন্য নগর বাইরে শৃঙ্গার বনে গমন করেন। নানা গাছ ও ফুল ফলে শোভিত ছিল সে বন।

সেই বনের কাছে চণ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে এক-জন ব্রহ্মচারী সাধনা করত। রাজাকে সেই বনে রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে দেখে ভোগবাসনা জাগে ব্রহ্মচারীর মনে। সে মনে মনে ভাবল, শুধু তপস্যা করে করে সারা জীবনটা কাটালাম। সংসার সুখ ও নারীসঙ্গ কি জিনিস তা জানলাম না।

সে আরও ভাবল, আমার পরম সৌভাগ্য এই সময় এখানে রাজা বিক্রমাদিত্য উপস্থিত আছেন। আমি বরং তার কাছ থেকে একখণ্ড জমি দান হিসাবে চেয়ে নিয়ে কোন সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে ভোগসুখে বাকি জীবনটা কাটাব।

এই ভেবে রাজার কাছে এসে রাজাকে আশীর্বাদ করল ব্রহ্মচারী।

রাজা তাঁকে বললেন, হে ব্রহ্মচারী, কোথা হতে আসছেন আপনি?

ব্রহ্মচারী বলল, আমি ঐ জগদম্বার মন্দিরের পূজারী। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রহ্মচারীরূপে দেবীর সেবা করে আসছি। আজ রাত্রিশেষে দেবী আমায় বললেন, এবার তুমি সংসারী হও, পুত্র উৎপাদন করো। পরে মোক্ষলাভের চেষ্টা করবে। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ— এই তিন আশ্রমের কাজ না করে যে মোক্ষলাভ করতে চায় তার মোক্ষলাভ হয় না। তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে গিয়ে তোমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করো। তিনি তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন।

ব্রহ্মচারী রাজা বিক্রমাদিত্যকে তার এই মনগড়া কাহিনীটি বলল।

রাজা বুঝতে পারলেন ব্রহ্মচারী মিথ্যা কথা বলছে। তবু তিনি ভাবলেন, এ এখন আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে। সুতরাং এর ইচ্ছা পূরণ করাই আমার কর্তব্য। শাস্ত্রে বলে, দীনজনে দান এবং আশ্রিতদের প্রতিপালন করে কোন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

এই ভেবে রাজা বিক্রমাদিত্য সেই ব্রহ্মচারীকে সেখানে একটি নগর নির্মাণ করিয়ে তা দান করলেন। সেই সঙ্গে পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচশত ঘোড়া, চার হাজার সৈনিক ও একশত বিলাসিনী রমণীও তাকে দিলেন। সেই নগরের নাম রাখলেন চণ্ডিকাপুর।

এই উপাখ্যান শেষ করে পুতুল বলল, হে মহারাজ, আপনার যদি এমন উদারতাগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সপ্তম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত। রাজ্যে কারো মনে কোন লোক হিংসা বা পাপপ্রবৃত্তি ছিল না। সকলের মনেই ছিল জীবের প্রতি দয়া আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

রাজধানীতে ধনদ নামে এক বণিক ছিল। সে ছিল অতুল ধনসম্পদের অধিকারী। কিন্তু ক্রমে ধনসম্পদের উপর বিতৃষ্ণা জাগল তার মনে। সে ভাবল শরৎকালের মেঘের মত সমস্ত ধন ঐশ্বর্য ও ভোগসুখ ক্ষণস্থায়ী। এ সংসার অনিত্য। সব কর্মের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ধর্মপথে চলার মধ্যেই আছে প্রকৃত সুখ।

সে ঠিক করল সৎপাত্রে দান করে তার অর্জিত ও সঞ্চিত সব ধনের সদ্ব্যবহার করতে হবে। বটগাছের ফল যেমন কোন ভাল জমিতে অল্প পরিমাণে পড়লেও তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় তেমনি সৎপাত্রে ধন দান করলে সে ধনও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

এই উদ্দেশ্যে ধনদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে তার সমস্ত ধন সৎপাত্রে দান করতে আরম্ভ করল।

এরপর একদিন সে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য দ্বারাবতীর পথে রওনা হলো। সে ভাবল শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হলেই সফল হবে তার দানব্রত।

সমুদ্রতীরে গিয়ে দীন দরিদ্রকে অনেক কিছু দান করল ধনদ। তারপর দ্বারাবতী যাবার জন্য নৌকোয় চাপল। নৌকোয় করে যেতে যেতে দেখল সমুদ্রের মধ্যে একটি পর্বতের উপর একটি দেবমন্দির রয়েছে।

তৎক্ষণাৎ সেই মন্দিরে গিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীকে ভক্তিভরে পূজা দিল ধনদ। তারপর বাঁদিকে তাকাতেই সে দেখল এক পুরুষ ও এক নারীর ছিন্ন-মস্তক পড়ে রয়েছে এবং দেওয়ালের উপর লেখা আছে, যদি কোন পরোপ-কারী পুরুষ নিজের গলা কেটে সেই রক্ত দিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজা করে তাহলে এই পুরুষ ও নারী পুনরায় জীবন ফিরে পাবে।

এই দৃশ্য দেখে ধনদ বিস্মিত হলো। যাই হোক, সে দ্বারাবতী গিয়ে কৃষ্ণ-মূর্তি দর্শন করে স্তব ও পূজা নিবেদন করল। তারপর সে তার নিজের দেশে ফিরে এল।

সবাইকে কৃষ্ণের প্রসাদ বিতরণের পর সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

রাজা তার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে বললেন।

ধনদ তখন সমুদ্রের মধ্যে পর্বতোপরি সেই মন্দিরে দেখা দৃশ্যের কথা সব বলল।

এই দৃশ্যের কথা শুনে রাজা বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তিনি

ধনদকে সঙ্গে নিয়ে তখনি সেই মন্দিরের পথে চলে গেলেন। মন্দিরে গিয়ে বাঁ পাশে পড়ে থাকা সেই ছিন্ন মস্তক দুটিও দেখতে পেলেন।

রাজা তখন মনে মনে সংকল্প করলেন তিনি তাঁর মাথা কেটে সেই রক্তে দেবীর পূজা করে মৃত পুরুষ ও নারীকে পুনর্জীবিত করে তুলবেন।

এই ভেবে তিনি খড়্গ দিয়ে নিজের গলা কাটতে উদ্যত হতেই সেই ছিন্ন মস্তক দুটি আপনা থেকে নিজ নিজ দেহে যুক্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা জীবন ফিরে পেল।

দেবী ভুবনেশ্বরী তখন রাজার সামনে আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত থেকে খড়্গটি নিয়ে বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার ত্যাগ ও পরোপকারব্রত দেখে। এখন বর চাও আমার কাছে।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তবে এই দম্পতিকে রাজ্য দান করো।

দেবী তখন 'তথাস্তু' বলে সেই দম্পতিকে রাজ্য দান করলে রাজা ধনদকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, এই রকম পরোপকার করার শক্তি যদি আপনার থাকে তাহলেই এ সিংহাসনে বসতে পারেন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

অষ্টম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল তাঁকে বলল, আগে আমার কথা শুনুন। তারপর বসবেন।

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমাদিত্য নানা কারণে প্রসিদ্ধ ও ঔদার্যগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি চরদের মাধ্যমে রাজ্যের প্রজাদের অবস্থার কথা জানতেন।

একবার রাজার একদল চর রাজ্য পরিভ্রমণ করে এসে রাজার সঙ্গে দেখা করলে রাজা বিশেষ কিছু জানার থাকলে তা বলতে বললেন।

তখন চরেরা বলল, মহারাজ, কাশ্মীর রাজ্যে এক ধনী বণিক বাস করে।

সেই বণিক পাঁচক্রোশ লম্বা একটি পুকুর কাটিয়েছে। সেই পুকুরের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছে। কিন্তু পুকুরে জল উঠছে না।

বণিক জলের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের অনেক জপ তপ ও যাগযজ্ঞ করায়। তবু কিন্তু জল উঠল না পুকুরে।

বণিক তখন পুকুরের পাড়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল, হায়, এত চেষ্টাতেও জল উঠল না। আমার সমস্ত অর্থ ও শ্রম বিফল হলো।

একদিন দৈববাণী হলো বণিকের উপর। দৈববাণী বলল, হে বণিক, দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের কণ্ঠরক্তে যেদিন এই পুকুরের মাটি সিক্ত হবে সেদিন এ পুকুর নির্মল জলে ভরে যাবে। এছাড়া জল পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই।

এই দৈববাণী শোনার পর সেই পুকুরের পাড়ে অন্নছত্র খুলল বণিক। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু লোক এসে আহার করতে লাগল।

বণিকের লোকেরা উপস্থিত লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে ঘোষণা করতে লাগল, যে ব্যক্তি তার কণ্ঠরক্ত দিয়ে এই পুকুরের মাটি সিক্ত করবে তাকে একশো কলসী সোনার টাকা দেওয়া হবে।

কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন লোক এগিয়ে এল না তার কণ্ঠরক্ত দান করতে।

রাজা বিক্রমাদিত্য একথা চরমুখে শোনার পর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর রাজ্যে সেই বণিকের কাটানো পুকুরের পাড়ে চলে গেলেন।

পুকুর ও তার মাঝে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির দর্শন করে প্রীত হলেন রাজা। তিনি ভাবলেন, আমার কণ্ঠরক্তে এই পুকুর নির্মল জলে ভরে উঠলে অসংখ্য লোকের উপকার হবে। আমার শরীর একশো বছর থাকলেও তা একদিন বিনষ্ট হবেই। সুতরাং পরের উপকারের জন্য এ জীবন দান করব।

এই ভেবে রাজা বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে পূজা সেরে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, হে জলদেবতা, তুমি আমার কণ্ঠরক্ত পান করে এই পুকুর জলে পরিপূর্ণ করে তোল।

এই বলে খড়্গ তুলে নিজে কণ্ঠচ্ছেদ করতে উদ্যত হতেই দেবতা তাঁর হাত থেকে খড়্গটি নিয়ে বললেন, হে বীর, তোমার বীরত্ব ও পরোপকার-ব্রত দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, হে দেব, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই পুকুরটি জলে পরিপূর্ণ কর।

দেব বললেন, হে রাজন, তুমি শীঘ্র এই পুকুরের তীরে উঠে যাও। তারপর এই পুকুরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

রাজা তখন দেবতার নির্দেশমত পুকুরের তীরে উঠে পুকুরপানে তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে নির্মল জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পুকুরটি।

এরপর রাজধানীতে ফিরে গেলেন রাজা।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুলটি বলল, হে রাজন, আপনার যদি এইরকম পরোপকারিতা ও ঔদার্যগুণ থাকে তবেই সিংহাসনে বসতে পাবেন।

ভোজরাজ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নবম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলেই আর একটি পুতুল বলল, মহারাজ, আগে আমার কথা শুনুন। তারপর বসবেন।

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রীর নাম ছিল ভট্টি, উপমন্ত্রীর নাম গোবিন্দ, সেনাপতির নাম চন্দ্রশেখর এবং পুরোহিতের নাম ছিল ত্রিবিক্রম।

ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম ছিল কমলাকর। কমলাকর খুব বিলাসী ছিল। সে তার বাবার টাকায় উত্তম খাদ্য ভোজন করত এবং মূল্যবান বস্ত্র পরত। এইভাবে সে বিলাসবহুল জীবন কাটাত।

এইসব দেখে কমলাকরের বাবা রাজপুরোহিত ত্রিবিক্রম একদিন তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি পূর্বজন্মের পুণ্যবলে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু তোমার মন বিলাসব্যসন ও ভোগ বাসনায় আসক্ত। তুমি পড়াশুনা বা কোন সৎকর্ম করো না। শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও। এখন বিদ্যার্জনের সময় যদি বিদ্যাভ্যাস না করো তাহলে পরে দারুণ দুঃখ পেতে হবে। যাদের বিদ্যা বা ধর্ম নেই তারা পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ। বিদ্যার চেয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার আর নেই। দেশে বিদেশে বিদ্যাই প্রকৃত বন্ধু, বিদ্যাই প্রকৃত ধন। বিদ্যা রাজাদের কাছে পূজনীয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি মহাকুলজাত হলেও তার জন্ম বিফল। তাই বলছি, আমি যতদিন জীবিত থাকব তোমাকে বিদ্যাভ্যাস করে যেতে হবে।

বাবার কথা শুনে অনুতপ্ত হলো কমলাকর। সে মনে মনে সংকল্প করল, সে মানুষ হয়ে উঠবে। যেমন করে হোক উপযুক্ত বিদ্যার্জন করে সে যদি কোনদিন সর্বগুণে ভূষিত হয়ে উঠতে পারে তবেই সে তার বাবাকে এ মুখ দেখাবে।

এই সংকল্প সাধনের জন্য বাড়ি থেকে তখনি বেরিয়ে পড়ল কমলাকর। সে সোজা কাশ্মীর রাজ্যে চলে গেল। সেখানে গিয়ে পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি ভট্টের সঙ্গে দেখা করল। তাঁকে প্রণাম করে সে বলল, আমি মূর্খ, আপনার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে বিদ্যালাভ করতে এসেছি আপনার কাছে। আপনি দয়া করে আমায় বিদ্যাদান করুন।

কমলাকরের নিষ্ঠা দেখে খুশি হলেন পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি। তিনি বিদ্যাদানে সম্মত হলেন।

কমলাকর দিনরাত পরম যত্নসহকারে গুরুর সেবা করে যেতে লাগল।

এইভাবে অনেকদিন গুরুসেবার পর গুরু সদয় হলেন কমলাকরের উপর। একদিন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধসারস্বত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন কমলাকরকে। এই মন্ত্রবলে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল কমলাকর। তারপর গুরুর অনুমতি নিয়ে সে তার বাড়ি চলে গেল।

যাওয়ার পথে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হলো সে। তখন নরেন্দ্র সেন ছিলেন কাঞ্চীনগরের রাজা। সেই নগরে নরমোহিনী নামে এক রূপসী বারবণিতা ছিল। তাকে যে দেখত তার অসামান্য রূপে মোহগ্রস্ত ও উন্মাদ হয়ে যেত সে। আবার কেউ যদি তার ঘরে যেত তাহলে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে তাকে বধ করে তার রক্ত পান করত।

এই কথা শুনে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল কমলাকর। তাকে দেখে খুশি হলেন তার বাবা মা।

পরদিন সে তার বাবার সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে দেখা করল রাজার সঙ্গে। রাজাকে তার কিছু বিদ্যানৈপুণ্যও দেখাল।

রাজা তাকে নানা উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন।

এরপর পর বিদেশে গিয়ে কমলাকর উল্লেখযোগ্য কোন কিছু দেখেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

কমলাকর বলল, আমি যে দেশে গিয়েছিলাম সে দেশে কিছু দেখিনি। কিন্তু ফিরে আসার পথে কাঞ্চীনগরে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনলাম।

রাজা বিক্রমাদিত্য তা শুনে কমলাকরকে নিয়ে কাঞ্চীনগরে চলে গেলেন।

বিক্রমাদিত্য সেখানে গিয়ে নরমোহিনীকে দেখে তার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়ে রাত্রিকালে তার ঘরে গেলেন। নরমোহিনী রাজাকে তাম্বুলদানে আপ্যায়িত করে বলল, আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করায় আমার গৃহ ধন্য হলো।

নরমোহিনী ঘুমিয়ে পড়লে রাজা সেই ঘরেই রয়ে গেলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষসের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাজা লুকিয়ে রইলেন ঘরের এক কোণে। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল।

রাক্ষস ঘরের মধ্যে দেখল শুধু নরমোহিনী শুয়ে আছে। অন্য কোন লোক নেই। তাই সে ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় রাজা অতর্কিতে আক্রমণ করে বধ করলেন রাক্ষসকে।

গোলমাল শুনে নরমোহিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে রাক্ষসকে মৃত দেখে খুশি হয়ে রাজাকে বলল, হে রাজন, আজ আমি রাক্ষসের উপদ্রব হতে মুক্ত হলাম চিরদিনের মত। প্রতিদানে আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, যদি আমার আদেশ পালনে সম্মত হও তাহলে কমলাকরকে বিয়ে করে তাকে সুখী করো।

রাজার আদেশমত নরমোহিনী স্বামীরূপে বরণ করে নিল কমলাকরকে।

এরপর উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, হে রাজন, যদি আপনার এসব মহৎ গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

দশম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে দশম পুতুল বলল, থামুন রাজন, আগে আমার কথা শুনুন। তারপর বসবেন।

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একবার উজ্জয়িনীতে এক যোগী এসে উপস্থিত হন। বেদ, চিকিৎসা, গণিত, সঙ্গীত প্রভৃতি এমন বিদ্যা নেই যাতে পাণ্ডিত্য ছিল না সেই যোগীর। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এই যোগীর খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে লোকমুখে।

রাজা তা শুনতে পেয়ে এই যোগীকে রাজসভায় আনার জন্য একজন পুরোহিতকে পাঠান।

পুরোহিতের সঙ্গে যোগী রাজার কাছে এসে বললেন. রাজন, আপনি যদি মন্ত্রসাধনা করেন তাহলে জরা মৃত্যুকে জয় করতে পারবেন।

রাজা বললেন, সে মন্ত্র আমায় শিখিয়ে দিলে আমি তা সাধনা করব।

যোগী তখন রাজাকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, একবছর ব্রহ্মচারী হয়ে এই মন্ত্র জপ করবেন। তারপর দূর্বাঘাস দিয়ে মন্ত্রজপ শেষ করে ঐ দূর্বাঘাসের দশভাগের এক ভাগ হোমের আগুনে আহুতি দেবেন। এইভাবে পূর্ণাহুতি দেবার পর সেই হোমকুণ্ড হতে এক পুরুষ ফলহাতে বেরিয়ে এসে সেই ফল আপনাকে দান করবে। সেই ফল খেলেই আপনি জরামৃত্যুহীন হয়ে উঠবেন। বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠবে আপনার দেহ।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন যোগী।

এদিকে সেই হোমানলে পূর্ণাহুতি দেবার সময় সেই জ্বলন্ত হোমকুণ্ড হতে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হয়ে রাজাকে একটি ফল দান করলেন।

সেই ফল নিয়ে রাজা যখন নগরে প্রবেশ করে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শীর্ণদেহ এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন, হে রাজন, আপনি সকলের দুঃখ দূর করেন। আমার দুঃখ আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করুন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে দয়া হলো রাজার। তিনি তখন তাঁর সেই প্রাপ্ত ফলটি দিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে। ভাবলেন, এই ফলটি খেলেই জরাব্যাধি হতে মুক্ত হবে ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ. আপনার যদি এমন গুণ থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

পুতুলের কথা শুনে হতবাক হয়ে রইলেন ভোজরাজ।

একাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে একাদশ পুতুল বলল, মহারাজ, আগে আমার একটি কথা শুনুন। তারপরে বসবেন।

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে রাজা বিক্রমাদিত্যের কোন

দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি অন্য সব রাজাদের নিজের অধীনে এনে তাদের উপর আদেশ দিয়ে রাজ্যপালন করতেন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্যের দেশভ্রমণের ইচ্ছা হয়। তাই তিনি মন্ত্রীর উপর রাজকার্য পরিচালনার ভার দিয়ে সন্ন্যাসী সেজে সারারাজ্য ঘুরে বেড়াতে থাকেন। যেখানে কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখতে পান সেখানেই কিছুদিন থেকে যান।

এইভাবে একদিন তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন এক বনপথে সূর্য অস্ত যায়। কাছে কোন ঘরবাড়ি দেখতে না পেয়ে একটি গাছে আশ্রয় নেন তিনি। সেই গাছে চিরঞ্জীব নামে এক বৃদ্ধ পাখি বাস করত। তার পুত্র ও পৌত্রেরা প্রতিদিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে নিজেরা আহার করে সন্ধ্যাবেলায় একটি করে ফল এনে চিরঞ্জীবকে দিত। চিরঞ্জীব সেই ফল খেয়ে সুখে দিন কাটাত।

সেদিন রাতে চিরঞ্জীব ফল খাবার পর তার পুত্র ও পৌত্রদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াও। কোথাও কোন আশ্চর্য জিনিস দেখেছ কি?

একটি পাখি বলল, আজ আমি কোন আশ্চর্য জিনিস দেখিনি। তবু আজ আমার মন বড় খারাপ।

চিরঞ্জীব বলল, কিজন্য তোমার মন খারাপ?

পাখি বলল, বললে কোন ফল হবে কি?

চিরঞ্জীব বলল, সুহৃদের কাছে দুঃখের কথা বললে নিশ্চযই কোন ফল হয়।

পাখিটি তখন বলল, উত্তর দেশে একটি পাহাড়ের ধারে পলাশনগর নামে একটি নগর আছে। সেই পাহাড়ে একটি রাক্ষস বাস করত। সে প্রতিদিন সেই নগরে এসে যাকে সামনে পেত তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ে বসে খেত।

একদিন সেই নগরের সব লোক মিলিত হয়ে বলল, তুমি যাকে তাকে বধ করো না খাবারের জন্য। আমরা প্রতিদিন একটি করে লোককে পাঠাব তোমার কাছে। তুমি তাকেই খেও।

এই প্রস্তাবে রাজী হলো রাক্ষস।

তার পর থেকে প্রতিদিন আহারের জন্য রাক্ষসের কাছে একজন করে লোককে পালাক্রমে পাঠানো হত। এইভাবে বহুদিন কেটে যায়। কাল যে

ব্রাহ্মণের পালা সে পূর্বজন্মে আমার বন্ধু ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে আর স্ত্রী আছে বাড়িতে। ছেলেকে পাঠালে বংশনাশ হয় আর সে নিজে গেলে তার স্ত্রী বিধবা হয়। স্ত্রীকে পাঠালে সংসার শূন্য হয়ে যায়। তাই তাদের এই দুঃখে আমি দুঃখিত।

তার কথা শুনে অন্য পাখিরা বলল, বন্ধুর দুঃখে যে দুঃখিত হয় এইভাবে সে-ই প্রকৃত বন্ধু।

রাজা বিক্রমাদিত্য পাখির দুঃখের কথা শুনে তখনি পলাশনগরে চলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে যার পালা ছিল সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে তাকে অভয় দিলেন। পরদিন সকালবেলায় স্নান করে নিজে সেই বধ্যশিলায় গিয়ে বসে রইলেন রাক্ষসের অপেক্ষায়।

যথাসময়ে রাক্ষস এসে দেখল বধ্যশিলার উপর একজন নির্ভয়ে বসে আছে। সে তখন বলল, কে তুমি? মৃত্যুভয় পাও না? এই শিলায় এসে আমার খাবারের জন্য যে বসে সে ভয়ে আগেই মরে যায়। কিন্তু তুমি কে? রাজা বললেন, এ কথায় তোমার কি লাভ। আমি আমার এই দেহ পরের জন্য দান করছি। তুমি তোমার কাজ করো।

তখন রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করল, লোকটা সত্যিই সাধু পুরুষ। এ পরের জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করছে। একে মারলে আমার পাপ হবে।

রাক্ষস এই ভেবে রাজাকে বলল, হে সাধু পুরুষ, তুমি পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করছ। তুমি সত্যিই পূণ্যবান। তোমাকে মারলে আমার পাপ হবে। তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, হে রাক্ষস, যদি তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে আজ থেকে মানুষ বধ বন্ধ করো। তোমার কাছে নিজের প্রাণ যেমন প্রিয় তেমনি সকলের কাছে তার নিজের প্রাণ প্রিয়। নিজের প্রাণ যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমনি পরের প্রাণও রক্ষা করা উচিত।

রাজার কথায় রাজী হয়ে সেদিন থেকে মানুষ বধ বন্ধ করল রাক্ষস। রাজাও খুশি মনে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন পরোপকারিতাগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে দ্বাদশ পুতুল বলল, আগে আমি বিক্রমাদিত্যের একটি কাহিনী বলব। আপনি শুনুন, তারপর বসবেন।

বিক্রমাদিত্যের বাজত্বকালে উজ্জয়িনীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক বাস করত। তার অগাধ ধনসম্পত্তি থাকলেও সে টাকাপয়সা খরচ করতে চাইত না। কালক্রমে ভদ্রসেনের মৃত্যু হয়।

তার পুবন্দর নামে একটিমাত্র পুত্র ছিল। পুরন্দর ছিল তার বাবার ঠিক উল্টো এবং অমিতব্যযী। বাবার মৃত্যুর পর সে বন্ধুদের নিয়ে ভোগবিলাসে সব টাকাকড়ি অকাতরে খরচ করে যেতে লাগল।

ধনদ নামে পুরন্দরের এক বন্ধু ছিল। সে একদিন পুরন্দরকে বলল, তুমি বণিকপুত্র। ধন উপার্জন করাই তোমার কর্তব্য। তা না করে তুমি ক্ষত্রিয়পুত্রের মত অর্থব্যয় করে যাচ্ছ কেন? ভবিষ্যতে ধন কাজে লাগবে বলেই বুদ্ধিমানেরা ধন উপার্জন করে।

পুবন্দর বলল, ভবিষ্যতে কবে কোনদিন কাজে লাগবে বলে ধন ব্যয় না কবার কোন অর্থ হয় না। বিপদ আপদ এলে উপার্জিত ধনও ক্ষয় হয়ে যায়। বুদ্ধির অতীত বিষয়ে শোক ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়।

এইভাবে কারো কোন কথা না শুনে টাকা খরচ করে যেতে লাগল পুরন্দর। কিছুদিনেব মধ্যেই ভোগবিলাসে সব অর্থ ক্ষয় করে ফেলল সে। সে তখন নিঃস্ব হয়ে উঠল একেবারে। তার বন্ধুরা তার সঙ্গ ত্যাগ করল।

পুবন্দর তখন মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের পাদদেশে একটি গ্রামে চলে গেল। সেই গ্রামের পাশে একটি বাঁশবন ছিল। রাত্রিবেলায় পুরন্দর একটি বাড়ির চাতালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে কার আর্ত চিৎকারে সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল পুরন্দরের। ঘুম থেকে জেগে উঠেই সে দেখল সেই বাঁশবনের ভিতর থেকে 'আমাকে বাঁচাও একটা রাক্ষস আমায় মারছে'—এই বলে একটি মেয়ে চিৎকার করছে।

পুরন্দর কিন্তু একা দুপুররাতে সেই অন্ধকার বাঁশবনের মধ্যে যেতে সাহস করল না।

পরদিন সকালে সে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করল, ঐ বাঁশবন থেকে রাত্রিবেলায় একটি মেয়ে চিৎকার করছিল কেন বলতে পারেন?

গ্রামবাসীরা বলল, রোজ রাতে ঐ বনের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চিৎকার শোনা যায়। কিন্তু ভয়ে কেউ দেখতে যায় না সেখানে।

পুরন্দর এই কথা শুনে সে তার বাড়ি ফিরে এল। তারপর সে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে এই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা জানাল।

রাজা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পুরন্দরের সঙ্গে সেই গ্রামে চলে গেলেন। তারপর রাত্রিবেলায় নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে একটি তরোয়াল নিয়ে সেই বাঁশবনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন এক ভীষণাকার রাক্ষস একটি মেয়েকে প্রচণ্ডভাবে মারছে আর মেয়েটি আর্তনাদ করছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য তখন রাক্ষসকে বললেন, রে পাপিষ্ঠ! এই অনাথা মেয়েটিকে মারছ কেন?

রাক্ষস বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কি? তুমি চলে যাও, তা না হলে তোমাকেও মরতে হবে।

রাজা তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলেন রাক্ষসকে। দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তরবারি দিয়ে রাক্ষসের মাথা কেটে ফেললেন রাজা।

মেয়েটি তখন রাজার পায়ে পড়ে বলল, হে প্রভু, আজ আপনি আমায় শাপমুক্ত করে সকল দুঃখ থেকে উদ্ধার করলেন।

রাজা বললেন, কে তুমি?

মেয়েটি বলল, এই গ্রামে এক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম। আমি রূপের গর্বে সব সময় মত্ত হয়ে থাকতাম। তাঁকে প্রায়ই মনোকষ্ট দিতাম। একদিন তিনি আমায় শাপ দেন, তুই যেমন আমায় সারা-জীবন দুঃখ দিয়েছিস তেমনি তুইও তোর সারাজীবন ধরে কষ্ট পাবি। রোজ রাতে এক রাক্ষস এসে তোকে পীড়ন করবে।

আমি তখন এই শাপের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি শাপমুক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম।

তিনি তখন বললেন, যদি কোনদিন কোন বীরপুরুষ এসে রাক্ষসকে বধ করে তাহলে তার পায়ে প্রণাম করলে তুই মুক্তি পাবি এই শাপ থেকে। আমার সব ধনসম্পদ তাকেই দিবি।

এই বলে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। এখন থেকে আমি আপনার অধীন হলাম। এই ধনপূর্ণ কলসটি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা সেই ধন নিজে না নিয়ে পুরন্দরকে দিয়ে দিলেন। রাজার আদেশে পুরন্দর সেই মেয়েটিকে বিয়ে করল। রাজা তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পুতুল এই কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন সাহস ও বীরত্ব থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, হে রাজন, রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প শুনুন।

একবার বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দিয়ে যোগীর বেশে দেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি গ্রামে একরাত ও শহরে পাঁচরাত কাটাতেন।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক নগরে এসে উপস্থিত হন। সেই নগরের বাইরে নদীর ধারে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের চাতালে বসে মহাজনরা প্রাচীন পুরাণকাহিনী শুনছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নদীতে স্নান করে এসে সেই চাতালে বসে পুরাণ-কথা শুনতে লাগলেন। তখন পুরাণ থেকে পরোপকারের কথা শোনান হচ্ছিল। যে পরের উপকার করে সে-ই পুণ্যবান আর যে পরকে দুঃখ দেয় সে-ই পাপী। যে পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হয় সে-ই প্রকৃত ধার্মিক।

রাজা বিক্রমাদিত্যও একমনে এই সব পুরাণকথা শুনছিলেন। এমন সময় এক আর্ত চিৎকারে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। সকলে দেখল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে নিয়ে নদী পার হতে গিয়ে নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।

যে সব মহাজন পুরাণকথা শুনছিল নদীর ধারে মন্দিরের চাতালে বসে ব্রাহ্মণ তাদের লক্ষ্য করে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু পরোপকার সম্বন্ধে অত সব পুরাণকথা শুনেও তারা কেউ গেল না ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করার জন্য।

কিন্তু বিক্রমাদিত্য থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভয় নেই, ভয় নেই' বলে অভয় দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রবল স্রোতের কবল থেকে ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে নদীর কূলে নিয়ে এলেন।

ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে বললেন, প্রথম প্রাণ পেয়েছিলাম বাবা ও মায়ের কাছ থেকে, আজ আবার দ্বিতীয়বার প্রাণ দিলেন আপনি। আপনি আমার যে উপকার করেছেন তার প্রতিদানে আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই। আমি এই গোদাবরী নদীর জলে বারো বছর ধরে মন্ত্র জপ করে যে পুণ্য লাভ করেছি তা আপনাকে দান করলাম। তাছাড়া চান্দ্রয়াণি ব্রত করে অনেক কষ্ট ভোগ করে আমার যা পুণ্য হয়েছে তাও দিলাম আপনাকে।

এই বলে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন ব্রাহ্মণ।

এমন সময় এক রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের কাছে এলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাজন, কে তুমি?

রাক্ষস বলল, আমি এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। এই নগরেই আমার বাস ছিল। আমার ধর্মে কোন মতিগতি ছিল না। আমি যত সব দুষ্কর্ম করে বেড়াতাম। গুরু ও সাধুদের প্রতি কোন ভক্তি ছিল না আমার; তাদের নিন্দা করতাম। তাই সেই পাপের ফলে আমি রাক্ষস হয়ে এই গাছে হাজার বছর ধরে কষ্ট ভোগ করছি। আজ আপনি দয়া করলে আমি মুক্তি পাব।

রাজা একথা শুনে এর আগে নদী হতে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে যে সব পুণ্য ফল পেয়েছিলেন তা সব দান করলেন সেই রাক্ষসকে। সেই পুণ্যফলে সে দিব্যরূপ লাভ করে রাজার প্রশংসা করতে করতে স্বর্গে চলে গেল। রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, আপনার যদি এমন পরোপকার গুণ ও মহত্ত্ব থাকে তবেই এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

চতুর্দশ উপাখ্যান

পরদিন সকালে ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে চতুর্দশ পুতুল বলল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। আপনি আগে তা শুনুন।

একবার বিক্রমাদিত্য ঠিক করলেন তিনি দেশভ্রমণ করে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস আছে আর কোথায় কোন তীর্থে কোন দেবতা আছেন তা দেখবেন।

এই ভেবে তিনি যোগীর বেশে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি এক নগরে এসে পৌঁছলেন। সেই নগরে একটি নদীর ধারে দেবী জগদম্বার মন্দির ছিল। রাজা নদীতে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের এক জায়গায় বসলেন।

এমন সময় এক যোগী এসে রাজার পাশে বসলেন।

যোগী রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা হতে আসছেন?

রাজা বললেন, আমি এক তীর্থযাত্রী। তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি।

যোগী বললেন, না, আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য। আপনাকে উজ্জয়িনীতে দেখেছি। আমি আপনাকে চিনি। এখানে কি জন্য এসেছেন?

রাজা বললেন, যোগীবর, আমার ইচ্ছা দেশভ্রমণ করে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস আছে তা দেখব। তাতে সাধুদর্শনও হবে।

যোগী বললেন, আপনি বিজ্ঞ হয়ে অবিজ্ঞের মত কাজ করছেন। রাজ্যে যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে কি করবেন?

রাজা বললেন, আমি মন্ত্রীর হাতে রাজকার্যের ভার দিয়ে এসেছি।

যোগী বললেন, আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করছেন। রাজ্য ও অমূল্য রত্ন নিজের হাতে রাখতে হয়। কখন কি বিপদ হয় তা বলা যায় না। রাজ্য ছেড়ে দেশভ্রমণ করা আপনার উচিত নয়।

রাজা বললেন, দৈবই একমাত্র সত্য। দেবতারাও দৈবের বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন না। বজ্র যাঁর অস্ত্র, বৃহস্পতি যাঁর গুরু, অমরাবতী যাঁর দুর্গ এবং ঐরাবত যাঁর হাতি সেই দেবরাজ ইন্দ্রও মাঝে মাঝে যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে যান। সুতরাং যা হবার তা হবেই। এ বিষয়ে একটি গল্প শুনুন।

উত্তরদেশে নদীপর্বতবন্ধন নামে একটি নগর আছে। সেই নগরে রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজশেখর পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। একবার তাঁর জ্ঞাতিরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজাকে নির্বাসিত করে। রাজশেখর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজা কোন নগরের বাইরে একটি গাছের নিচে স্ত্রীপুত্র সহ আশ্রয় নিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সেই গাছে পাঁচটি পাখি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

একটি পাখি বলল, এই নগরের রাজা মারা গেছেন। তাঁর কোন সন্তান নেই। এখন কে রাজা হবেন ?

অন্য একটি পাখি বলল, এই গাছের নিচে যে একজন রাজা বসে আছেন তিনিই হবেন এ রাজ্যের রাজা।

আর একজন পাখি বলল, তাই হোক।

সকালে পাখিরা গাছ ছেড়ে আহারের সন্ধানে চলে গেল। রাজা রাজশেখর তখন আহ্নিক সেরে সূর্যকে প্রণাম করে নগরের রাজপথে এলেন।

এদিকে সেই রাজ্যের অমাত্যরা রাজা ঠিক করার জন্য সেই দেশের প্রথা অনুসারে একটি মঙ্গলহস্তীকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে একটি মালা দিয়ে রাজপথে ছেড়ে দেয়। হাতিটি রাজশেখরকে দেখেই তাঁর গলায় সেই মালাটি পরিয়ে দেয়। তারপর তাঁকে তার পিঠে চাপিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। অমাত্যরা তখন রাজশেখরকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজারূপে অভিষেক করে।

এদিকে রাজশেখরের জ্ঞাতিশত্রুরা যখন শুনল রাজশেখর আবার এক রাজ্যের রাজা হয়েছেন তখন তারা সকলে মিলিত হয়ে তাঁর রাজধানী আক্রমণ করল। রাজশেখর তখন অন্তঃপুরে বসে পাশা খেলছিলেন রাণীর সঙ্গে।

রাণী বলল, রাজা, তুমি যখন পাশা খেলছ তখন জ্ঞাতিশত্রুরা সৈন্য নিয়ে তোমার রাজধানী আক্রমণ করেছে। এখন যুদ্ধে যাও।

রাজা বললেন, আমি দৈবের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। দৈবের বিধানে আমি রাজ্য হারিয়ে আবার রাজ্য পাই। দৈবই আসল বল।

রাজশেখরের কথা শুনে যে দৈব তাকে রাজা করেছিলেন সেই দৈব ভীষণ মূর্তি ধারণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শত্রুসৈন্যদের পরাজিত করলেন। রাজশেখর নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন।

এই কাহিনী শুনে যোগী সন্তুষ্ট হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে একটি কাশ্মীরের শিবলিঙ্গ দিয়ে বললেন, এটি চিন্তামণির মত কাজ করবে। প্রতিদিন ভক্তিভরে এই লিঙ্গের পূজা করবেন। যখন যা চিন্তা করবেন তাই পাবেন।

রাজা শিবলিঙ্গটি হাতে নিয়ে যোগীকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে নগরের পথ দিয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বলল, আজ তিন দিন হলো আমি আমার শিবলিঙ্গটি হারিয়ে ফেলেছি। অথচ লিঙ্গপূজা না করে আমি কোনদিন জলগ্রহণ করি না। তাই তিন দিন উপবাসী আছি। আপনি দয়া করে আপনার হাতের ঐ শিবলিঙ্গটি আমায় দিলে আমার অনেক উপকার হয়।

রাজা সেই শিবলিঙ্গটি ব্রাহ্মণকে দান করে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এই রকম মহানুভবতা থাকে তাহলে এ সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ কোন কথা বলতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে পঞ্চদশ পুতুলটি বলল, আমি বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প বলব। আগে গল্প শুনুন, তারপর বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের বসুমিত্র নামে এক পুরোহিত ছিলেন। রাজ-পুরোহিত বসুমিত্র সুদর্শন ও সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র। তিনি পরোপকারীও ছিলেন।

একদিন বসুমিত্র ভাবলেন, গঙ্গাস্নান না করলে সঞ্চিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। গঙ্গাস্নানে সকল লোকই পাপমুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়। গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য লাভ করা যায় তা কখনো তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ ও দানের দ্বারা পাওয়া যায় না। এই জন্যই গঙ্গাকে পতিতপাবন বা পাপহারিণী বলা হয়।

এই সব চিন্তা করে বসুমিত্র রাজধানীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে পূজা দিয়ে প্রয়াগে এসে মাঘী পূর্ণিমায় আবার স্নান করলেন। তারপর তাঁর নগরের পথে যাত্রা করলেন।

ফেরার পথে একটি নগর পেলেন। সুরবালা নামে শাপভ্রষ্টা এক নারী সেই নগরে রাজত্ব করত। সেই নগরে লক্ষ্মীনারায়ণের এক বিরাট মন্দির ছিল।

বসুমিত্র সেই মন্দিরে গিয়ে দেখলেন মন্দিরের বাইরে এক বিরাট লোহার পাত্রে তেল গরম হচ্ছে। সেখানে কয়েকজন লোক বসে রয়েছে। যে সব বিদেশী ভ্রমণকারী সেই মন্দিরে যাচ্ছে তারা তাদের বলছে, যদি কোন সাহসী ব্যক্তি এই গরম তেলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মন্মথ সঞ্জীবনী নামে এক অপ্সরা তার গলায় বরমাল্য দেবে।

বসুমিত্র তা শুনে তার নগরে ফিরে এলেন। তারপর রাজার সঙ্গে দেখা করে তার তীর্থভ্রমণের সব বৃত্তান্ত বললেন। শেষে রাজা তাঁকে আশ্চর্য

জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করলে বসুমিত্র সুরবালা ও গরম তেলের কথা বললেন।

রাজা কৌতূহলী হয়ে তখনি বসুমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই মন্দিরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভক্তিভরে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করে সেই গরম তেলের পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলে 'হায় হায়' করতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার দেহটি এক বিকৃত মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। তখন অপ্সরা মন্মথ সঞ্জীবনী অমৃত এনে সেই মাংসপিণ্ডের উপর ছিটিয়ে দিতেই রাজা আবার দিব্যরূপ লাভ করলেন।

তখন সেই অপ্সরা রাজার গলায় বরমাল্য দেবার জন্য এগিয়ে এল।

রাজা তাকে বললেন, হে অপ্সরা, যদি তুমি আমার অনুগত হতে চাও তাহলে আমার কাছে উপস্থিত এই ব্রাহ্মণ বসুমিত্রকে পতিরূপে বরণ করে নাও।

অপ্সরা বলল, হে রাজন, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এই বলে বসুমিত্রের গলায় বরমাল্য দান করল অপ্সরা মন্মথ সঞ্জীবনী।

এরপর রাজধানীতে ফিরে এলেন রাজা।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন সাহস ও উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষোড়শ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে ষোড়শ পুতুলটি বলল আসুন, আগে বিক্রমাদিত্যের একটি কাহিনী শুনুন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বার হন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে বহু মূল্যবান বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ তাঁকে দান করে। বিক্রমাদিত্য তখন সেই সব রাজাদের আপন আপন রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন।

রাজা নগরমধ্যে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় এক দৈবজ্ঞ এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, এখন থেকে চারদিন আপনার নগর প্রবেশের পক্ষে অশুভ। চারদিন পর নগরে প্রবেশ করবেন।

রাজা তখন নগরের বাইরে এক উদ্যানে তাঁবু খাটিয়ে চার দিন কাটালেন।

তখন বসন্তকাল। একদিন মন্ত্রী এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হয়েছে। প্রকৃতি বসন্ত সমাগমে নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। আজ বসন্তের পূজা করুন। বসন্ত আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হলে সকল অমঙ্গল দূর হবে।

মন্ত্রীর কথায় সম্মত হয়ে বসন্ত পূজার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন রাজা। মন্ত্রী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কুশলী গায়ক ও নর্তকীদের সেই পূজা উৎসবে যোগদান করার জন্য আহ্বান করলেন। রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষ যোগদান করল সে অনুষ্ঠানে।

পূজা মণ্ডপে একটি সিংহাসনের উপর লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে রাজা ষোড়শোপচারে পূজা করলেন। পূজা শেষে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের নানা দানে সম্মানিত করলেন।

এর পর গায়করা বসন্তরাগে আলাপ করে বসন্তের স্তুতি করতে লাগল। রাজা সকলকে তাম্বুলদান করে প্রীত করলেন।

এমন সময় সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, হে রাজা, আমার একটি আবেদন আছে।

রাজা তাকে তা বলতে বললে ব্রাহ্মণ বলল, আমি একজন ব্রাহ্মণ। নন্দীবর্ধন গ্রামে আমার বাড়ি। আমার আটটি পুত্র হয়। কিন্তু কোন কন্যা-সন্তান না হওয়ায় আমি স্ত্রীকে নিয়ে জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করি, হে দেবী, আমি কন্যালাভ করলে তোমার নামে তার নাম রাখব। তাছাড়া কন্যার সমান ওজনের সোনা দান করব আর কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করব।

এর পর আমি একটি কন্যাসন্তান লাভ করি। এখন বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। এবার তার বিবাহকাল উপস্থিত। একাদশ স্থানে আছেন বৃহস্পতি। কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে কন্যার সমপরিমাণ ওজনের সোনা দান করতে হবে। এত সোনা কোথায় পাব? একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্যই আমায় এই দায় হতে উদ্ধার করতে পারেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।

রাজা বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। যথাস্থানেই এসেছেন আপনি।

এই বলে রাজা তখনি কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আদেশ দিলেন ব্রাহ্মণের

কন্যার সমপরিমাণ ওজনের সোনা দাও এবং বিবাহের অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অষ্টবর্গের অর্ধেক আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা দাও।

প্রয়োজনীয় সোনার বেশী পেয়ে আনন্দিত হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল ব্রাহ্মণ। রাজাও নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন শুভ মুহূর্তে।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন দানশীলতা ও ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

সপ্তদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে সপ্তদশ পুতুলটি বলল, আগে আমার কাহিনী শুনুন মহারাজ। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ ও ত্যাগ কারো ছিল না এবং এখনো নেই। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য ও জ্ঞান অনেকেরই থাকে। কিন্তু ত্যাগ গুণ সকলের থাকে না। রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন এই বিরল গুণের অধিকারী।

একদিন কোন এক রাজার কাছে এক স্তুতিকার রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণগান করছিল। তা শুনে সেই স্তুতিকারের উপর ভীষণ রেগে যান সেই রাজা। তিনি স্তুতিকারকে বললেন, তোমরা সবাই শুধু বিক্রমাদিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার গুণগান করে বেড়াও। কিন্তু তার মত রাজা কি সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই?

স্তুতিকার বলল, না মহারাজ, দানশীলতা, পরোপকার, শৌর্য ও বীর্যে তাঁর মত রাজা আর একজনও নেই। যে দেহ সকল মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু সেই দেহকেও তুচ্ছজ্ঞান করতেন বিক্রমাদিত্য।

তখন সেই রাজা বললেন, আমিও রাজা বিক্রমাদিত্যের মত পরোপকার করব।

তারপর একজন যোগীকে ডেকে সেই রাজা বললেন, প্রতিদিন যাতে পরোপকারের জন্য নতুন নতুন পাত্র পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন।

যোগী বলল, এমন কোন উপায় আমার জানা নেই। তবে কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন চতুঃষষ্ঠি যোগীনীচক্রের পূজা করুন। পূর্ণাহুতির সময় নিজ দেহ আহুতি দিতে হবে।

যোগীর কথামত রাজা তাই করলেন। পূর্ণাহুতিস্বরূপ রাজা নিজদেহ দান

করলে যোগিনীরা প্রসন্ন হয়ে সে দেহ ফিরিয়ে দিয়ে রাজাকে বর চাইতে বলল।

রাজা বললেন, হে মাতৃগণ, যদি তোমরা প্রসন্ন হয়ে থাক আমার উপর তাহলে আমার প্রাসাদে যে সাতটি বড় কলস আছে তা প্রতিদিন সোনায় ভরে দাও।

যোগিনীরা বলল, যদি তিনমাস প্রতিদিন অগ্নিতে তোমার দেহ আহুতি দিতে পার তাহলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে।

রাজা এর পর থেকে প্রতিদিন যজ্ঞ করে অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দিতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন এই ঘটনার কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে পূর্ণাহুতির সময় অগ্নিকুণ্ডে নিজের দেহটি নিক্ষেপ করলেন।

তখন যোগিনীরা রাজার জীবন ফিরিয়ে দিয়ে তাকে বলল, হে মহাসত্ত্ব, তুমি কে? তোমার দেহত্যাগের কারণ কি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, পরের উপকারের জন্য এ দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি।

যোগিনীরা বলল, তোমার উপর আমরা প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার উপর যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে রাজা প্রতিদিন মৃত্যুর জন্য যে কষ্টভোগ করছেন তা বন্ধ করো এবং এর প্রাসাদে সাতটি কলস সুবর্ণপূর্ণ করো।

যোগিনীরা তাই করল। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, পরের জন্য নিজের দেহ উৎসর্গ করার এমন ক্ষমতা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি এ সিংহাসনে বসুন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে আমার কাহিনীটি শুনুন।

অসৎ ও দুর্জনের সংসর্গে বিনাশ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করা যায়। তাতে শ্রেয় লাভ হয়। কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে নেই। পরের

মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। অকারণে ভৃত্যদের দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। গুরুতর দোষ না দেখলে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নেই। লক্ষ্মী চঞ্চলা। ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধন বিতরণ করা উচিত। আর্তজনকে দান করা উচিত। স্ত্রীদের কাছে গুপ্তকথা প্রকাশ করতে নেই।

রাজা বিক্রমাদিত্য নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

একদিন এক বিদেশী পর্যটক রাজসভায় এসে রাজাকে দর্শন করে বসলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্র, আপনার নিবাস কোথায়?

পর্যটক বলল, আমার নিবাস বলতে কিছু নেই। সর্বদা ঘুরে বেড়াই।

রাজা বললেন, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। আশ্চর্য জিনিস কোথাও দেখেছেন?

পর্যটক বলল, উদয়াচলে এক সূর্যমন্দিব আছে। তার পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সেই গঙ্গার তীরে পাপবিনাশন নামে এক শিবমন্দির আছে। সেখানে গঙ্গার জল থেকে প্রতিদিন একটি করে সোনার স্তম্ভ বেরিয়ে আসে। সেই স্তম্ভের উপর নবরত্নখচিত একটি সিংহাসন আছে। সেই স্বর্ণস্তম্ভটি সূর্য ওঠার পব থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে মধ্যাহ্নকালে সূর্যকে স্পর্শ করে। আর সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা গঙ্গার মধ্যে ডুবে যায়। প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখা যায়।

রাজা বিক্রমাদিত্য কৌতূহলবশে সেই পর্যটকের সঙ্গে তখনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। রাত্রিটা গঙ্গাতীরেই কাটালেন।

পরদিন সূর্য ওঠার সময় দেখলেন গঙ্গাগর্ভ থেকে একটি স্বর্ণস্তম্ভ উঠল। সেই স্তম্ভের মাথায় ছিল একটি রত্নসিংহাসন।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সাহসের সঙ্গে সেই স্তম্ভের উপর গিয়ে বসলেন। স্তম্ভটি রাজাকে নিয়ে সূর্যমণ্ডলের দিকে উঠে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। রাজা সূর্যের কাছে উপস্থিত হলে সূর্যের প্রখর কিরণে রাজার দেহ ঝলসে এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো।

রাজা সেই অবস্থাতেই সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ ও জগতের একমাত্র চক্ষু আদিত্যদেবকে প্রণাম জানাই।

তখন সূর্যদেব অমৃত দিয়ে সেই স্তম্ভের অভিষেক করলে দিব্যদেহ লাভ করলেন রাজা।

সূর্যদেব তখন রাজাকে বললেন, তুমি মহাসত্ত্বশালী পুরুষ। যে সূর্যমণ্ডল

সকল মানুষের অগম্য তুমি সেখানে উপস্থিত হয়েছ। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, মুনিদের অগম্য এই সূর্যমণ্ডলে এসে আপনার দর্শন লাভ করেছি। আমার মত ভগ্যবান আর কে আছে! আপনার কৃপায় আমার কোন কিছুর অভাব নেই।

রাজার কথায় সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর কুণ্ডলদুটি দান করলেন। বললেন, এই কুণ্ডলদ্বয় প্রতিদিন এক ভার করে সোনা দান করবে।

রাজা সেই কুণ্ডলদুটি নিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনীর পথে রওনা হলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলল, মহেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

এর পর ব্রাহ্মণ বলল, আমি এক গৃহস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার সংসারে অনেক পোষ্য। ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ করি তাতে আমাদের উদরপূরণ হয় না।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা দয়াপরবশ হয়ে কুণ্ডলদুটি তাকে দান করে বললেন, এই কুণ্ডলদুটি প্রতিদিন এক ভার করে স্বর্ণদান করবে।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হযে রাজার স্তুতি করতে করতে চলে গেল। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন গুণ ও ত্যাগব্রত থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

কোন উত্তর দিতে পারলেন না ভোজরাজ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প শুনুন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্যাধ এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, অরণ্যের মধ্যে এক বিরাট আকারের বরাহ এসেছে কোথা থেকে। আপনি যদি দেখতে চান ত আসুন।

তা শুনে রাজা রাজপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে তখনি বনে চলে গেলেন।

দেখলেন বরাহটি সত্যিই বনের মধ্যে রয়েছে। রাজা তখন সকলের সঙ্গে একযোগে ছাব্বিশটি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন সেই বরাহকে।

কিন্তু বরাহ সেই অস্ত্রের আঘাত অবলীলাক্রমে সহ্য ও উপেক্ষা করে একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করল।

রাজাও তার পিছু পিছু সেই গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহার ভিতরটা ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কিছুদূর যাওয়ার পর রাজা সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আকাশচুম্বী এক নগর দেখতে পেলেন। বহু অট্টালিকায় শোভিত ছিল সে নগর।

নগরমধ্যে গিয়ে রাজা এক রাজভবন দেখতে পেলেন। বিরোচনপুত্র বলি সেখানে রাজত্ব করতেন।

রাজভবনে বিক্রমাদিত্য যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলি উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে রত্নখচিত এক সিংহাসনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, আপনি কোথা হতে এসেছেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আপনাকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে আমি উজ্জয়নী থেকে এখানে এসেছি।

বলি বললেন, আপনার পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হলো।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আপনার জন্ম ও জীবন কত গৌরবময়! বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আপনার গৃহে নিত্য বিরাজমান।

বলি বললেন, এখানে আসার আপনার কারণ কি? আমার জানতে বড় ইচ্ছা করছে।

রাজা বললেন, হে দানবপতি, আমি আপনাকে দেখার জন্যই এখানে এসেছি অন্য কোন কারণ নেই।

ব'ল বললেন, যদি আমাকে বন্ধু ভেবে থাকেন তাহলে আপনি কিছু প্রার্থনা করুন।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার কিছুরই অভাব নেই। আপনার প্রাসাদে যা আছে তা সবই আমার আছে।

বলি বললেন, আমি সে অর্থে একথা বলছি না। আসলে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ কিছু উপহার আমি দিতে চাই।

এই বলে বলি রস ও রসায়ন নামে দুটি বস্তু দান করলেন।

রাজা বলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীর পথে যাত্রা শুরু করতেই এক ব্রাহ্মণ তার পুত্রকে সঙ্গে করে

রাজার সামনে এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং পীড়িত। আমার পোষ্য অনেক, অনাহারে দিন কাটছে। যাতে পর্যাপ্ত ভোজন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে পারি এমন ধন দান করুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, এখন আমার কাছে কোন ধন নেই। তবে রস ও রসায়ন নামে দুটি দ্রব্য আছে। দুটি দ্রব্যের দুটি গুণ আছে। রসের সঙ্গে সংযোগে সপ্তধাতু সোনা হয়ে উঠতে পারে। আর রসায়ন সেবন করলে জরামৃত্যু হতে মুক্ত হতে পারা যাবে চিরতরে। এই দুটি বস্তুর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বলল, রসায়ন সেবন করলে জরামৃত্যু হতে চিরতরে পরিত্রাণ পাওয়া যবে। আমাকে রসায়ন দান করুন।

কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র বলল, রসায়নে আমাদের কি লাভ? জরামৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেলে অনন্তকাল ধরে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করে যেতে হবে আমাদের। তার থেকে যে রস সংযোগে সপ্তধাতু সোনাতে পরিণত হয় সেই রস আমাদের দান করুন।

পিতাপুত্রের মতবিরোধ দেখে রাজা তাদের রস ও রসায়ন দুটিই দিলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। রাজাও উজ্জয়িনী চলে গেলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, বলুন রাজা, এমন দানশীলতা যদি আপনার থাকে তবেই এ সিংহাসনে বসুন।

বিংশতি উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে আমার একটি কাহিনী শুনুন। পরে বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বছরের মধ্যে ছয়মাস রাজসভায় বসে রাজকর্ম পরিচালনা করতেন আর ছয়মাস দেশভ্রমণ করে বেড়াতেন।

একবার দেশভ্রমণকালে পদ্মালয় নামে এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হন রাজা বিক্রমাদিত্য। সেই নগরমধ্যে এক উদ্যানে স্বচ্ছ জলে ভরা একটি সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরে স্নান করে তার তীরে একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন তিনি।

এই সময় কয়েকজন বিদেশী এসে সেই সরোবরে জলপান করে সেই গাছের ছায়াতলে বসল। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল।

তারা বলাবলি করছিল, এত দেশ আমরা ভ্রমণ করলাম। কিন্তু মহাপুরুষের দর্শনলাভ আজও হলো না আমাদের।

তাদের মধ্যে একজন বলল, মহাপুরুষের দর্শনলাভ হবে কি করে! তাঁরা যেখানে থাকেন সে স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য। সেখানে গেলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। সুতরাং যে চেষ্টায় জীবন বিপন্ন হতে পারে সে চেষ্টা আমাদের কখনো করা উচিত নয়।

রাজা বিক্রমাদিত্য একথা শুনে বললেন, শোন বিদেশী, আমি একমত হতে পারলাম না তোমার সঙ্গে। পৌরুষ ও সাহসের সঙ্গে মানুষ যদি কোন কাজ করতে এগিয়ে যায় তাহলে সে যত দুঃসাধ্যই হোক না কেন, তাতে সে সফল হবেই। এইভাবে অনেক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়। কিন্তু অলস ও ভীরু প্রকৃতির লোকেরা কোন কাজেই সফল হতে পারে না। সংসারে সাহসী, পরিশ্রমী ও বীর্যবান পুরুষেরা সাফল্য ও সুখলাভ করে থাকেন।

রাজার কথা শুনে সেই বিদেশী বলল, হে মহাঃসত্ত্ব, আপনি কি কিছু করতে মনস্থ করেছেন ?

রাজা বললেন, এখান থেকে দ্বাদশ যোজন দূরে এক অরণ্যমধ্যে এক পর্বত আছে। সেই পর্বতের উপর যোগীশ্রেষ্ঠ ত্রিকালনাথ সাধনা করেন। তাঁর কাছে দাবি করলে তিনি যত সব আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন। আমি সেখানেই যাব।

বিদেশীরা বলল, আমরাও তাহলে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে যাব।

রাজা বললেন তাঁর কোন আপত্তি নেই।

সেই বিদেশীরা রাজার সঙ্গে পথ চলতে লাগল। পথে এক দুর্গম অরণ্য দেখে রাজাকে বলল তারা, সে পর্বত আর কতদূর ?

রাজা বললেন, এখান থেকে এখনো আট যোজন দূর। পথ খুবই দুর্গম ; তবু শোন, আমরা সেখানে যাবই। আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

ছয় যোজন পথ অতিক্রম করার পর তারা দেখল ভয়ঙ্কর একটি বিরাট সাপ তাদের পথরোধ করে পড়ে আছে। সেই সাপের মুখ থেকে আগুনের মত বিষ বার হচ্ছে। সাপ দেখে সকলেই ভয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু রাজা পালালেন না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। সাপটা তাঁকে

জড়িয়ে ধরে দংশন করল। রাজা তখন বিষাক্ত ক্ষত জায়গাটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে সেই পর্বতের উপরে উঠে যোগী ত্রিকালনাথকে দর্শন করলেন।

যোগীরাজকে দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই বিষমুক্ত হয়ে আগের মত সুস্থ হয়ে উঠলেন রাজা।

যোগীরাজ তখন হেসে রাজাকে বললেন, হে মহাসত্ত্ব, মানুষের অগম্য বিপদসংকুল এই জায়গায় কেন এসেছ?

রাজা বললেন, আমি আপনাকে শুধু দর্শন করতে এসেছি।

যোগী বলল, তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে?

রাজা বললেন, আমার কোন কষ্টই হয়নি। এবং আপনাকে দর্শন করে আমার সকল পাপতাপ দূর হলো। আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হলাম।

যোগীবর তখন সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি খুঁটি, একটি যোগদণ্ড আর একটি কাঁথা দিলেন। তারপর বললেন, এই খুঁটি দিয়ে মাটির উপর যতগুলি রেখা টানা যায়, এক দিনে তত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারা যাবে। এই যোগদণ্ডটি ডান হাতে নিয়ে মৃত সৈন্যের গায়ে স্পর্শ করলেই সে জীবিত হয়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে। আর বাঁ হাতে নিয়ে স্পর্শ করলে শত্রুসৈন্য বিনাশ হবে। এই কাঁথাখানি ঈপ্সিত যে কোন বস্তু দান করবে।

এই তিনটি বস্তু গ্রহণ করে রাজা যোগীকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

পথে যেতে যেতে দেখলেন এক রাজপুত্র আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ সংগ্রহ করছে।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করছ?

রাজপুত্র বলল, আমি রাজপুত্র। কিন্তু জ্ঞাতিশত্রুরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়। আমি নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এইভাবে নিঃস্ব নিরাশ্রয় হয়ে দরিদ্রজীবন যাপন করা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমি তাই সংকল্প করেছি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে এ জীবন ত্যাগ করব।

রাজা তাকে বুঝিয়ে শান্ত করে যোগীর কাছ থেকে পাওয়া সেই তিনটি মহামূল্যবান বস্তু রাজপুত্রকে দিয়ে তাদের গুণাগুণ বুঝিয়ে দিলেন। এই সব বস্তুর সাহায্যে সে তার হারানো রাজ্য ফিরে পেয়ে নতুন ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে।

রাজকুমার অতিশয় আনন্দিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল। রাজাও তার রাজধানী উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার মধ্যে এই উদারতা আছে কি?

ভোজরাজ নীরবে মাথা নত করে রইলেন।

একবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে যেতেই আর একটি পুতুল বলল, আমি একটি কাহিনী বলছি আগে শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসিন্ধু নামে এক মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রীর একটি পুত্র ছিল। তার নাম ছিল অনর্গল। লেখাপড়াতে তার একেবারেই মন ছিল না। সব সময় সে শুধু খেলাধূলা করে বেড়াত।

মন্ত্রী একদিন তার পুত্রকে ডেকে বলল, তুমি আমার পুত্র হয়েও মূর্খ হয়ে রইলে। বিদ্যালাভের কোন চেষ্টাই কর না। অজাত, মৃত এবং মূর্খ এই তিনের মধ্যে অজাত এবং মৃত বরং ভাল। কারণ তাদের থেকে অল্প দুঃখ পাওয়া যায়। কিন্তু মূর্খ পুত্র যতকাল বেঁচে থাকে ততকালই দুঃখ দেয়।

এই সব ভর্ৎসনার কথা শুনে অনুতপ্ত হলো অনর্গল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করল যেমন করে হোক সে বিদ্যালাভ করে মানুষ হবে।

এই উদ্দেশ্যে সে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল। ঘুরতে ঘুরতে সে এক নগরে গিয়ে এক উপাধ্যায়কে ধরে তার শিষ্য হয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে সে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হলো।

পথের ধারে একটি বনের মধ্যে এক দেবমন্দির দেখতে পেল সে। সেই দেবমন্দিরের কাছে পদ্মবনশোভিত এক মনোরম সরোবর ছিল। সেই সরোবরের একদিকের জল খুব উষ্ণ ছিল।

অনর্গল সরোবরের ধারে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। রাত্রি হলো। তখন এক সময় অনর্গল দেখল সরোবরের উষ্ণ জলের মধ্য থেকে আটজন দিব্যাঙ্গনা বেরিয়ে এসে সেই মন্দিরে গিয়ে দেবপূজা করে নাচগান করে দেবতাকে প্রীত করতে লাগল।

সকাল হতেই সেই দিব্যাঙ্গনারা অনর্গলকে দেখতে পেল। তাদের মধ্য থেকে একজন তাকে বলল, হে সৌম্য, আমাদের সঙ্গে আমাদের নগরমধ্যে এস।

কিন্তু তাদের জলের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে অনর্গলের ভয় হলো। ইচ্ছা হলেও সে যেতে পারল না তাদের সঙ্গে।

যথাসময়ে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এল অনর্গল।

পরদিন রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা সব বলল।

রাজা অনর্গলকে নিয়ে তখনি সেই অরণ্যমধ্যস্থিত মন্দিরে চলে গেলেন। সূর্য তখন সবেমাত্র অস্ত গেছে। রাজা ও অনর্গল সেই মন্দিরের বাইরে বসে রইলেন।

রাত্রি গভীর হলে সেই দিব্য কন্যারা জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরে গিয়ে পূজা সেরে নাচগান করতে লাগল সারারাত ধরে।

সকাল হতেই তারা রাজাকে দেখতে পেয়ে বলল, হে ভদ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের নগরে এস।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন সাহস এবং বীরত্বে অতুলনীয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্যাঙ্গনাদের পিছু পিছু জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। দিব্যাঙ্গনারা সপ্ত পাতালে তাদের নগরে প্রবেশ করল।

দিব্যাঙ্গনারা এবার রাজাকে বলল হে মহাসত্ত্ব, আপনার মত শৌর্যবীর্য কারো নেই। আমরা আপনার উপর প্রসন্ন হয়েছি। আপনি আমাদের এই নগরের রাজা হোন।

রাজা বললেন, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি নিতান্ত কৌতূহলের বশেই এখানে এসেছি।

দিব্যাঙ্গনারা বলল, তাহলে আপনি বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন, আগে বলুন আপনারা কারা? আপনাদের পরিচয় দান করুন।

দিব্যাঙ্গনারা বলল, আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধা।

রাজা বললেন, তাহলে আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধি দান করুন।

দিব্যাঙ্গনারা তখন রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত আটটি রত্ন দান করল।

রাজা সেই রত্নগুলি নিয়ে রাজধানীর পথে রওনা হলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করল ব্রহ্মার নাম করে।

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, কোথা হতে আসছেন আপনি ?

ব্রাহ্মণ বলল, চম্পাপুর নিবাসী আমি এক গরীব ব্রাহ্মণ। বাড়িতে অনেক পোষ্য। আহার জোটাতে পারি না। স্ত্রীর ভৎ র্সনা সহ্য করতে না পেরে অর্থ উপার্জনের আশায় বিদেশে এসেছি। নির্ধন পুরুষের কোন মূল্য নেই সংসারে।

ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনে মনে ব্যথা পেলেন রাজা। তখন তিনি দিব্যাঙ্গনাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই আটটি রত্নই দিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে। তারপর নিজের নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, রাজন, আপনার যদি এমন উদারতা ও দানশীলতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে আমার একটি গল্প শুনুন। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করতে করতে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আকাশচুম্বী এক প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন রত্নশোভিত সেই প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে বহু শিবালয় ও বিষ্ণুমন্দির।

রাজা এক সরোবরে স্নান করে এসে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে বিষ্ণুকে প্রণাম করে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন।

তারপর মন্দিরে বসে থাকা এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা, হে বিপ্র, কোথা হতে এসেছেন আপনি ?

ব্রাহ্মণ বলল, আমি এক তীর্থযাত্রী। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি কোথা হতে এসেছেন ?

রাজা বললেন, আপনার মত আমিও এক তীর্থযাত্রী।

ব্রাহ্মণ ভালভাবে রাজাকে দেখে বলল, আপনার চেহারা দেখে কিন্তু সাধারণ তীর্থযাত্রী বলে মনে হচ্ছে না। আপনার দেহে রাজলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি তেজস্বী ও বীরপুরুষ। আপনার রাজসিংহাসনে বসা উচিত ছিল। তবে সবই ভাগ্যের লিখন। এ লিখন কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

রাজা এই কথা স্বীকার করলেন।

এর পর রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনাকে এত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছে কেন?

ব্রাহ্মণ বলল, নিকটে নীল নামে একটি পর্বত আছে। সেখানে কামাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে পাতালে যাবার একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই বিবর পথের মুখ বন্ধ থাকে। কামাক্ষীমন্ত্র জপ করলে সেই দ্বার খুলে যায়। সেই বিবর পথের মাঝে আছে এক রসকুণ্ড। সেই রসের স্পর্শে অষ্টধাতু খাঁটি সোনা হয়ে যায়। আমি দ্বাদশবর্ষ কামাক্ষীমন্ত্র জপ করছি। কিন্তু সেই ভিতর দ্বার খোলেনি।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়ে তাঁর স্তব করে খড়্গ দিয়ে নিজেকে বলি দিতে গেলেন। এমন সময় দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। বল, কি বর চাও।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক, তাহলে এই ব্রাহ্মণকে রসকুণ্ডের রস দান করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে সেই ভিতর দ্বার উন্মুক্ত করে রসদান করলেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ তখন রাজার গুণগান করে চলে গেল সেখান থেকে।

রাজাও তাঁর নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, আপনি কি নিঃস্বার্থ, পরোপকারিতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন কখনো? আপনার যদি এমন গুণ থাকে ত সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

পরদিন সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল একটি গল্প বলল ভোজরাজকে।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ শেষ করে রাজধানীতে ফিরে আসার পর প্রচুর দান করেন। বহু লোককে দান ও ভোজনে তৃপ্ত করেন।

সেই রাত্রিতে ঘুমোতে ঘুমোতে এক স্বপ্ন দেখলেন রাজা। দেখলেন তিনি মহিষের পিঠে চেপে দক্ষিণ দিকে কোথায় যাচ্ছেন।

পরদিন সকালে রাজসভায় এসে ব্রাহ্মণদের কাছে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বললেন রাজা।

তা শুনে সর্বজ্ঞভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বললেন, স্বপ্ন দুই রকমের। কতকগুলি স্বপ্নের ফল শুভ আর এক শ্রেণীর স্বপ্ন অশুভ ফল দান করে। যেমন হাতির পিঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, শঙ্খ ও স্বুবর্ণদর্শন প্রভৃতি স্বপ্ন শুভ ফলপ্রদ হয়। কিন্তু মহিষ বা গদর্ভপৃষ্ঠে আরোহণ, কণ্টকবৃক্ষে আরোহণ, ভস্ম, শূকর ও বানরাদি দর্শন প্রভৃতি স্বপ্নের ফল অশুভ হয়।

যাই হোক, আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা অনিষ্টকর আপনার পক্ষে।

রাজা বললেন, তাহলে এর প্রতিবিধান কি?

সর্বজ্ঞভট্ট বললেন, আপনি প্রথমে স্নান করে যজ্ঞদর্শন করে ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করুন। তারপর নববস্ত্র পরিধান করে দেবতার আরাধনা করুন। সেই সঙ্গে অন্ধ, অনাথ, আর্ত, বধির, পঙ্গু প্রভৃতি অসহায় ও দীন-দুঃখী মানুষদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করে তাদের পরিতৃপ্ত করুন। এই সব দানের ফলে স্বপ্নজনিত অশুভ ও অনিষ্টকর প্রভাব খণ্ডিত হয়ে যাবে।

সর্বজ্ঞভট্টের কথামত রাজা তিন দিন ধরে পর্যাপ্ত দান করার জন্য কোষাগার উন্মুক্ত রাখলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, এমন দানশীলতা কি আপনার আছে?

ভোজরাজ উত্তর দিতে পারলেন না।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে আর একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পুরন্দরপুরী নামে এক নগর ছিল। সম্পদশালী নামে এক ধনী বণিক বাস করত সেই নগরে। তার চার পুত্র ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে একদিন সেই বণিক তার পুত্রদের ডেকে বলল, আমার মৃত্যুর

পর তোমরা চার ভাই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করতে পার। তাই আমি আগে থেকে আমার সব সম্পত্তি বড় ছোট অনুসারে ভাগ করে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর আমার নির্দেশমত তোমরা তা গ্রহণ করবে।

এর কিছুদিন পর বণিকের মৃত্যু হলো। তার ছেলেরা একসঙ্গে কিছুকাল থাকার পর ঝগড়া বিবাদ শুরু হলো তাদের মধ্যে।

তখন চার ভাই এক জায়গায় বসে স্থির করল, তাদের বাবার নির্দেশমত সব বিষয় সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পৃথকভাবে শান্তিতে বাস করবে।

এর পর তারা তাদের বাবার নির্দেশমত বাবার ঘরে খাটের নিচে মাটি খুঁড়ে একটি বড় ভাঁড় পেল তারা। সেই ভাঁড়ের মধ্যে চারটি কৌটো ছিল। একটি কৌটোর মধ্যে মাটি, একটিতে অঙ্গার বা পোড়া কাঠ, একটিতে হাড় এবং একটিতে কিছু খড় পাওয়া গেল।

এই সব দেখে চার ভাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা এর অর্থ কিছু বুঝতে পারল না।

তারা তখন বলতে লাগল, কে এমন ব্যক্তি আছে যে এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

এর পর চার ভাই যুক্তি করে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে সব কথা বলল। রাজসভায় অনেক পণ্ডিত ছিল। কিন্তু তারা কেউ এসবের অর্থ কিছু বুঝতে পারল না।

তখন ভাইরা হতবুদ্ধি হয়ে অন্য এক রাজার রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

সেই রাজ্যে এক কুমোরের ঘরে শালিবাহন বাস করত।

শালিবাহনের কানে কথাটা যেতেই সে নিজে থেকে রাজসভায় চলে গেল। সে বলল, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই ভাইরা একই পিতার পুত্র। এদের পিতা জীবিতকালেই তাঁর বিষয় সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে মাটি দিয়ে গেছেন। এর অর্থ হলো সমস্ত ভূসম্পত্তি বা জমি জ্যেষ্ঠ পুত্র পাবে। দ্বিতীয় পুত্রকে তিনি দিয়ে গেছেন খড়। এর অর্থ হলো যত ধান মজুত আছে তা সে পাবে। তৃতীয় পুত্রকে দিয়েছে হাড়। এর অর্থ হলো যত সব গৃহপালিত পশু আছে সে তা পাবে। চতুর্থ পুত্রকে দিয়ে গেছে অঙ্গার। তার অর্থ হলো, এই পুত্র সব সোনা পাবে।

শালিবাহন এইভাবে বিষয়ভাগের তাৎপর্যটা চার ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিষয়ভাগের কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠলেন। তিনি শালিবাহনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি শালিবাহনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে আহ্বান জানালেন তাঁর রাজসভায় আসার জন্য।

কিন্তু এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল শালিবাহন। সে বলল, রাজার কাছে আমার যাবার প্রয়োজন নেই। রাজার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনি আমার কাছে আসবেন।

দূতমুখে শালিবাহনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনি অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে শালিবাহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে প্রতিষ্ঠা নগরে উপস্থিত হলেন রাজা।

রাজা নগরদ্বার থেকে এক দূত পাঠালেন শালিবাহনের কাছে। দূত গিয়ে শালিবাহনকে বলল, মহারাজ এসেছেন। আপনি নগর বাইরে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করুন।

কিন্তু শালিবাহন নত হলো না। সে দূতকে বলল, রাজাকে তুমি বলবে, আমি একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দেখব রাজা বিক্রমাদিত্য কত বড় বীর।

দূতমুখে শালিবাহনের স্পর্ধার কথা শুনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

উভয়পক্ষের সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তাদের পদভরে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। দিকচক্র আন্দোলিত হলো। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

উভয়পক্ষের সৈন্যদল শত্রু বিনাশ করতে লাগল। অসংখ্য অশ্বক্ষুরের ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চারদিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা বিক্রমাদিত্যেরই জয় হলো। তিনি শালিবাহনের সব সৈন্যকে পরাজিত করলেন।

শালিবাহন তখন কোন উপায় না দেখে শেষ নাগকে স্মরণ করল। শেষ নাগ ছিল শালিবাহনের জন্মদাতা পিতা। শেষ নাগ পুত্রের সাহায্যে অসংখ্য সাপ পাঠান। সেই সব সাপেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রাজা বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদের দংশন করতে লাগল। বহু সৈন্য মারা গেল সাপের বিষে।

এই দৃশ্য দেখে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর মৃত সৈন্যদের বাঁচাতে জলে গা ডুবিয়ে নয় বছর ধরে বাসুকিমন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

অবশেষে বিক্রমাদিত্যের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বাসুকি এসে বর দিতে চাইলেন তাঁকে।

রাজা বললেন, হে নাগরাজ, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রেরিত সর্পগণ আমার যে সব সৈন্যদের দংশন করে হত্যা করেছে তাদের বাঁচিয়ে দিন। এর জন্য আপনি আমায় অমৃতকুম্ভ দান করুন।

বাসুকি অমৃতকুম্ভ দান করলেন রাজাকে।

রাজা সেই অমৃতকুম্ভ নিয়ে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন সময় পথে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, আমি এক ব্রাহ্মণ, আমি প্রতিষ্ঠা নগর থেকে আসছি। আপনি কোন প্রাণীকে কখনো বিমুখ করেন না। আপনার কাছে আমার একটি বস্তু চাইবার আছে।

রাজা বললেন, কি সে বস্তু? আপনি যা চাইবেন তাই আমি দেব।

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনার হাতে যে অমৃতকুম্ভ আছে সেটি আমায় দান করুন।

রাজা বললেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছে?

ব্রাহ্মণ বলল, শালিবাহন।

রাজা তখন সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। কিন্তু কোন উপায় নেই। তিনি ব্রাহ্মণকে দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে। তা না হলে অধর্ম হবে।

তাই তিনি ব্রাহ্মণকে বলল, হে বিপ্র, আপনি এই অমৃতকুম্ভ গ্রহণ করে আমার প্রতিশ্রুতি পালনে সাহায্য করুন।

সেই অমৃতকুম্ভ নিয়ে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট চিত্তে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, এই ধরনের ত্যাগ, উদারতা ও মহানুভবতা যদি আপনার আছে কি? যদি থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল একটি গল্প বলল। বলল, আগে এই গল্প শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় একদিন এক জ্যোতিষী এসে রাজাকে বললেন, সকল গ্রহ অনুকূল হয়ে আপনার মঙ্গল করুন। সূর্যদেব আপনাকে শৌর্যবীর্য দিন, চন্দ্র দিন ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল দিন সুমঙ্গল, বুধ দিন বুদ্ধি, বৃহস্পতি দিন গুরুত্ব, শুক্র দিন পুত্র, শনি দিন কল্যাণ, রাহু দিন বাহুবল আর কেতু বংশের উন্নতি দান করুন।

রাজা তখন সেই জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বছর কোন গ্রহের কোথায় স্থান তা বলুন।

জ্যোতিষী বললেন, এ বছর রবি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাধিপতি। শনি রোহিণী শকট ভেদ করে যাবে। তার ফলে দেশে অনাবৃষ্টি হবে। বরাহমিহির বলেছেন, শনি রোহিণী শকট ভেদ করে গেলে তখন ঘোর অনাবৃষ্টি এমন কি রক্তবৃষ্টিও হতে পারে, তখন সাগর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

রাজা বললেন, এর কি কোন প্রতিকারের উপায় নেই?

জ্যোতিষী বললেন, হ্যাঁ আছে। গ্রহহোম করলে বৃষ্টি হয়।

রাজা তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে গ্রহহোম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বললেন। অনুষ্ঠানের শেষে রাজা প্রচুর দান করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না।

রাজ্যের প্রজারা হাহাকার করতে লাগল। রাজা মহাসংকটে পড়লেন। তিনি প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের কথা ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় আকাশবাণী হলো, হে রাজন, যদি বত্রিশ লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের ছিন্নমস্তক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে উৎসর্গ করতে পার তাহলে তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

এই আকাশবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেবীর সামনে খড়্গ দিয়ে নিজের মাথাটি কাটতে উদ্যত হলেই দেবী তার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, তোমার সততা ও সাহস দেখে প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, হে দেবী, আমার উপর যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই অনাবৃষ্টি দূর করে সুজলা সুফলা করে তোল বসুন্ধরাকে।

দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান হলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষড়বিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল বলল, আগে আমার এই উপাখ্যানটি শুনুন।

একদিন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র সিংহাসনে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে তখন ছিলেন তেত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্ট আশী হাজার ঋষি, আটজন লোকপাল, উনপঞ্চাশ জন মরুৎ বা বায়ু, বারো জন আদিত্য, নারদ আর নয়জন অপ্সরা। সেই সঙ্গে গন্ধর্বরাও ছিল।

নারদ একসময় বললেন, সারা ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের মত কীর্তিমান, পরোপকারী ও মহাসত্ত্বগুণসম্পন্ন রাজা আর একজনও নেই।

নারদের কথা শুনে সভায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন।

কামধেনু বলল, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বসুন্ধরা সত্যিই বহুরত্নগর্ভা।

দেবরাজ ইন্দ্র তখন সুরভিকে ডেকে বললেন, তুমি মর্ত্যলোকে এখনি গিয়ে বিক্রমাদিত্যের দয়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণের বিষয় জেনে এখানে এসে আমাকে তা জানাও।

সুরভি তখন দুর্বল এক গরুর রূপ ধারণ করে মর্ত্যে গমন করল।

রাজা বিক্রমাদিত্য যখন একটি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সুরভি ইচ্ছা করে তাঁকে দেখতে পেয়ে কাদায় পড়ে গিয়ে উঠতে না পারার ভাণ করল। রাজার দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

রাজা তার কাছে এসে দেখলেন, গরুটি দুর্বল, কাদার মধ্যে তার পাগুলো ঢুকে গেছে, বার হতে পারছে না। এদিকে তার অদূরে একটি বাঘ তাকে খাবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে।

রাজা তখন গরুটিকে তোলার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তখন সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু বাঘের মুখে অসহায় গরুটিকে ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে যেতেও পারলেন না। তাই অস্ত্র হাতে সারারাত সেইখানে দাঁড়িয়ে গরুটিকে পাহারা দিতে লাগলেন।

রাত্রি শেষ হয়ে সকাল হতেই রাজার দয়া ও ধৈর্যগুণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে তখন নিজেই কাদা থেকে উঠে এসে রাজাকে বলল, হে রাজন, আমি গরু নই, সুরভি। স্বর্গ থেকে তোমার দয়া ও ধৈর্যগুণ নিজের চোখে

দেখার জন্য মর্ত্যে এসেছি। এখন বুঝলাম তোমার মত দয়াবান ও ধৈর্যশীল রাজা পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে বর দিতে চাই। প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই। কি প্রার্থনা করব ?

সুরভি বলল, আমার কথার অন্যথা হবে না। আমি তাহলে তোমার কাছেই থাকব।

এই বলে সুরভি রাজার সঙ্গে তাঁর বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, বিধাতা আমাকে দরিদ্র করেছেন। তাই আমি সকলকে দেখতে পেলেও আমাকে কেউ দেখতে পায় না।

রাজা বললেন, হে বিপ্র, কি চান আপনি ?

ব্রাহ্মণ বলল, আপনি প্রার্থীর কাছে কল্পতরু। আমার দারিদ্র্য যাতে দূর হয় তার ব্যবস্থা করুন।

রাজা তখন বললেন, আপনি তাহলে এই কামধেনুটি গ্রহণ করে আপনার দারিদ্র্য দূর করুন। কামধেনু আপনার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করবে।

এই বলে রাজা বিক্রমাদিত্য কামধেনুকে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিয়ে নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল এবার ভোজরাজকে বলল, এমন দয়া, ধৈর্যগুণ ও ত্যাগ আপনার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ কোন কথা বলতে পারলেন না।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল।

একবার দেশভ্রমণ করতে গিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য এক ধার্মিক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই রাজা শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করতেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন করতেন। সে রাজ্যের প্রজারা ছিল সদাচারী, দয়াশীল ও অতিথি-পরায়ণ।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে তিন চার দিন থাকবেন বলে ঠিক করেন। তিনি এক দেবমন্দিরে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে সেই মন্দিরে বসলেন।

এমন সময় রাজপুত্রের মত দেখতে সুদর্শন এক যুবক পট্টবস্ত্র পরে এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে একদল লোকের সঙ্গে সে মন্দিরে প্রবেশ করে। কুঙ্কুম ও চন্দনে লিপ্ত ছিল তার দেহ। যুবকটি তার দলের লোকদের কিছু বলার পর তারা চলে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ভাবতে লাগলেন কে এই যুবক।

পরদিন সেই যুবকটি একা এল মন্দিরে। কিন্তু সেদিন তার দেহে কোন বস্ত্র বা অলঙ্কার ছিল না।

রাজা কৌতূহলবশতঃ যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক, গতকাল তোমার দেহ বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। সঙ্গে অনেক বন্ধুও ছিল। কিন্তু আজ তোমার কেন এই হীন অবস্থা?

যুবকটি বলল, গতকাল আমার অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু দৈবদোষে আজ আমার এই অবস্থা হয়েছে।

রাজা তার পরিচয় জানতে চাইলেন।

যুবকটি বলল, আমি এক দ্যূতকার।

রাজা বললেন, তুমি পাশা খেলতে জান?

যুবক বলল, আমি পাশাখেলায় খুবই দক্ষ। তাছাড়া শারীরক্রিয়াও জানি। আমার যথেষ্ট বুদ্ধিও আছে। কিন্তু সবই নিরর্থক। দৈববলই প্রকৃত বল।

রাজা বললেন, তুমি বিচক্ষণ হয়েও ঘৃণ্য পাশাখেলার মত পাপকাজ কেন করো?

যুবক বলল, কর্মফল কে খণ্ডন করতে পারে?

রাজা বলল, দ্যূতক্রীড়া, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য এবং পরদারগমন —এই সাতটি পাপ থেকে সাধুব্যক্তিরা দূরে থাকেন। তুমিও দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করো।

যুবক বলল, দ্যূতক্রীড়াই আমার জীবিকা, কি করে ত্যাগ করব? আপনি যদি আমার অর্থ উপার্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে এ ক্রীড়া আমি ত্যাগ করব।

এমন সময় দুজন বিদেশী এসে মন্দিরের একপাশে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি পিশাচলিপি দেখেছি। তাতে লেখা আছে, এই মন্দিরের ঈশাণ কোণে তিনটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস আছে। যে নিজের কণ্ঠরক্ত দিয়ে ভৈরবকে তুষ্ট করতে পারবে সে সেই ধনলাভ করবে।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে খড়্গ নিয়ে কণ্ঠরক্ত দিয়ে ভৈরবকে তুষ্ট করার জন্য মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাকে আর শিরশ্ছেদ করতে হবে না। তোমার ত্যাগ ও সাহস দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।

রাজা ভৈরবকে বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই দ্যূতকারকে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস তিনটি দাও।

ভৈরব তখন কলস তিনটি দ্যূতকারকে দিলে সে রাজার স্তুতি করে চলে চলে গেল। রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন ত্যাগ গুণ ও সাহস থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অষ্টবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে আর একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল।

একবার পৃথিবী পর্যটন করতে গিয়ে একটি নগরে গিয়ে উপস্থিত হন রাজা বিক্রমাদিত্য। সেই নগরের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছিল।

সেই নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে একটি মন্দির ছিল। রাজা নদীতে স্নান করে এসে মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সেই মন্দিরের একপাশে বসে রইলেন।

এমন সময় চারজন বিদেশী এসে রাজার কাছে বসল। রাজা তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

সেই চারজন বিদেশীর একজন বলল, আমরা অপূর্ব এক দেশ থেকে আসছি।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, সে দেশে আশ্চর্য কোন জিনিস আছে ?

লোকটি বলল, সে দেশে বেতালপুরী নামে একটি নগর আছে। সেই নগরের এক মন্দিরে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন। সেখানকার রাজা দেশে যাতে কোন অমঙ্গল না হয় তার জন্য প্রতি বছর একজন পুরুষকে

সেই দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে দেবীকে তুষ্ট করেন। সেই নির্দিষ্ট দিনে কোন বিদেশী যদি সেই নগরে গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে তাকেই দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয়।

আমরাও না জেনে সেইদিন সেই নগরে গিয়ে পড়ি। নগরবাসীরা আমাদের বলি দেবার জন্য ধরতে এলেই আমরা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসি।

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য তখনি দেবী শোণিতপ্রিয়ার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপব দেবীকে প্রণাম বরে মন্দিরের মধ্যে এক জায়গায় বসলেন।

এই সময় একজন ভীত সন্ত্রস্ত লোককে বন্দী করে তাকে বলি দেবার জন্য আনা হলো। মন্দিরে তখন বলির বাজনা বাজতে লাগল।

লোকটিকে বলি দেওয়া হবে তা বুঝতে পেরে রাজা নিজের প্রাণবলি দিয়ে লোবটিকে বাঁচাবার সংবল্প করলেন।

রাজা তখন মন্দিবের পুরোহিত ও রাজপুরুষদের বললেন, হে মহাজনবৃন্দ, আপনারা এই লোবটিকে নিয়ে কি করবেন?

তারা বলল, একে আমরা দেবীর সামনে বলি দেব। তাহলে দেবী তুষ্ট হয়ে আমাদের মঙ্গল করবেন।

রাজা বললেন, এই লোকটি ভয়ে কাতর, এর দেহ দুর্বল এবং ক্ষীণ। একে বলি দিলে তুষ্ট হবেন না দেবী। তার থেকে এর পরিবর্তে আমাকে বলি দিন। আমার দেহ হৃষ্টপুষ্ট। আমার দেহের মাংস পেলে দেবী তুষ্ট হবেন। এই লোকটির মুক্তির বিনিময়ে আমি আমার এ দেহ দান করছি।

এই বলে রাজা সেই লোকটিকে মুক্ত করে নিজে দেবীর বেদীর সামনে গিয়ে নিজের হাতে খড়্গ নিয়ে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মহাসত্ত্ব, তোমার পরোপকারিতা দেখে তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে আজ হতে এই নরবলিপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান হলেন।

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে পরহিতব্রতী রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। রাজা তখন তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে নিজের নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজাকে বলল, যদি আপনার এই রকম পরোপকারিতা গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে আর একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল। বলল, এই গল্পটি আগে শুনুন।

একদিন রাজসভায় রাজকুমারদের সঙ্গে বসেছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। এমন সময় এক স্তুতিকার এসে বলল, মহারাজ, যতদিন গঙ্গানদী প্রবাহিত হতে থাকবে, যতদিন আকাশে সূর্য কিরণ দেবে, যতদিন সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গদেশে হীরক, ইন্দ্রনীল, স্ফটিক প্রভৃতি শিলা শোভা পাবে ততদিন আপনি পুত্রপৌত্রাদিসহ সুখে রাজত্ব করুন।

এইরূপ আশীর্বাদ করে স্তুতিকার বলল, আমি আপনার খ্যাতি শুনে অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনি প্রার্থীদের কাছে কল্পতরুর মত। আপনার খ্যাতি সপ্তসাগর বেষ্টিত সমগ্র ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত। আপনাকে পেয়ে আজ আমার দারিদ্র্যদশা দূর হবে।

স্তুতিকার আরও বলল, আপনাকে দেখে উত্তর দেশে চম্বরী নগরের রাজা ধনেশ্বরের কথা মনে পড়ছে। তিনি অকাতরে দরিদ্রদের ধন দান করতেন। একবার মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীর দিন বসন্তপূজার আয়োজন করেন তিনি। সেদিন অসংখ্য প্রার্থী এসেছিল সেই পূজানুষ্ঠানে। রাজা সেই প্রার্থীদের আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন। সেই রাজার পর উদারতার দিক থেকে আপনিই শ্রেষ্ঠ।

সেই স্তুতিকারের কথা শেষ হতে রাজা বিক্রমাদিত্য কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, এই লোকটিকে কোষাগারে নিয়ে গিয়ে এ যত রত্ন ও মুদ্রা চাইবে তা দিয়ে দাও।

কোষাধ্যক্ষ তাকে তার ইচ্ছামত ধনরত্ন দিলে স্তুতিকার রাজার কাছে এসে বলল, হে রাজন, আপনার দানে আজ আমি ঐশ্বর্যবান হলাম। আপনি সত্যিই তুলনার অতীত। আপনি ব্রহ্মার মত দীর্ঘজীবী হোন।

এই বলে সেই স্তুতিকার চলে গেল।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন উদারতা ও দানশীলতা থাকে তাহলে আপনি এ সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ আশ্চর্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল এক গল্প বলল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে ছিলেন। এমন সময় রাজসভায় এক যাদুকর এসে তার যাদুবিদ্যা দেখাতে চাইল। সে বলল, অনেক ঐন্দ্রজালিক তাদের কলাকৌশল দেখিয়েছে আপনাকে। আপনি নিজেও সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী। আজ আমাকে অনুমতি দিন, আমি একটি বুদ্ধির খেলা দেখাব।

রাজা বললেন, আজ সময় হবে না। আগামীকাল সকালে তোমার খেলা দেখব।

পরদিন সকালে দীর্ঘকায় অদ্ভুতদর্শন এক বিদেশী এসে প্রণাম করল রাজাকে। তার মুখে ছিল এক বিরাট দাড়ি; হাতে ছিল এক বিরাট খড়্গ। তার সঙ্গে ছিল একটি সুন্দরী নারী।

সভায় উপস্থিত রাজপুরুষেরা তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে বিদেশী, কোথা থেকে আসছেন আপনি?

বিদেশী বলল, আমি আগে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচারক ছিলাম। আমি শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে এসেছি। আমার সঙ্গে যে নারীকে দেখছেন তিনি আমার স্ত্রী। এখন স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের মহাযুদ্ধ বেধেছে। সুতরাং আমি সেখানে যাচ্ছি। শুনেছি রাজা বিক্রমাদিত্য পরস্ত্রীদের নিজের বোনের মত দেখেন। তাই তাঁর কাছে আমার স্ত্রীকে রেখে যেতে চাই।

তার কথা শুনে রাজাও বিস্মিত হলেন।

লোকটি এবার তার স্ত্রীকে রাজার কাছে রেখে খড়্গের উপর ভর করে আকাশে চলে গেল। আকাশ থেকে মার মার শব্দ আসতে লাগল।

সভার সকলে কৌতূহলী হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে একটি রক্তমাখা খড়্গ ও রক্তাক্ত একখানি হাত রাজসভার মাঝখানে এসে পড়ল।

এই দৃশ্য দেখে সভার সকলে বলল, এই নারীর স্বামীই নিশ্চয় দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই খড়্গ আর হাত এসে পড়ল।

এই সময় একটি ছিন্ন মুণ্ড ও মুণ্ডহীন দেহ এসে রাজসভায় পড়ল। তখন সেই বিদেশীর স্ত্রী বলল, আমার স্বামী যুদ্ধে শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর দেহের কাটা অঙ্গগুলিই তার প্রমাণ। আমিও আমার স্বামীর সহগামিনী হতে চাই। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলে সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।

এই বলে রাজার অনুমতি নিয়ে স্বামীর শবসহ সহমরণের জন্য চিতার আগুনে ঝাঁপ দিল সেই স্ত্রীলোকটি।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল।

পরদিন যথাসময়ে রাজা রাজসভায় বসলে সেই বিশালকায় লোকটি খড়্গ হাতে এসে কল্পবৃক্ষের ফুল দিয়ে গাঁথা একটি মালা পরিয়ে দিল রাজার গলায়। মধুকরেরা মধু খাচ্ছিল মালার উপর বসে। তারপর যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগল লোকটি।

এরপর লোকটি বলল, যুদ্ধশেষে দেবরাজ ইন্দ্র আমায় বললেন, হে বীর, তোমাকে আর মর্ত্যে থাকতে হবে না। তোমার শাপের ফল শেষ হয়েছে। আমি তখন তাঁকে বললাম, আমার স্ত্রীকে আমি মর্ত্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে রেখে এসেছি। আমি তাকে নিতে এসেছি। এখন হে রাজন, আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিন। আমি স্বর্গে চলে যাই।

তার কথা শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সভাসদরা বলল, তোমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে।

লোকটি তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা ও উপস্থিত সকলে চুপ করে রইলেন। কি উত্তর দেবেন তা খুঁজে পেলেন না। এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কেউ কখনো দেখেননি তাঁরা।

অবশেষে লোকটি বলল, হে রাজন, লোকবল্লভ মহাদ্রুম। আপনি ব্রহ্মার মত দীর্ঘজীবী হোন। আমিই সেই ঐন্দ্রজালিক। আমার ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য দেখালাম আপনাদের।

সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

এমন সময় কোষাধ্যক্ষ এসে রাজাকে জানাল, পাণ্ডরাজ্যের রাজা কর হিসাবে প্রচুর ধনরত্ন পাঠিয়েছেন।

কি পাঠিয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্য তা জানতে চাইলে কোষাধ্যক্ষ বলল, আটকোটি স্বর্ণমুদ্রা, তিরানব্বই কোটি মুক্তার ভার, পঞ্চাশটি হাতি ও তিনশত অশ্ব।

রাজা আদেশ দিলেন, ঐ সব কিছুই এই ঐন্দ্রজালিককে দিয়ে দাও।

কাহিনীশেষে পুতুল ভোজরাজকে বলল, এমন দানশীলতাগুণ যদি আপনার থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল তাঁকে আর একটি গল্প বলল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় এক দিগম্বর সন্ন্যাসী এসে রাজার হাতে একটি ফল দিল। তারপর রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, হে রাজন, আমি অগ্রহায়ন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন মহাশ্মশানে হোম করব। আপনি মহাসত্ত্বশালী পুরুষ। আমার ইচ্ছা আপনি আমার উত্তরসাধক হোন। সেই শ্মশানের নিকটে একটি শমীবৃক্ষে এক বেতাল বাস করে। অতি সন্তর্পণে তাকে আপনি নিয়ে আসবেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সন্ন্যাসী শ্মশানে হোম শুরু করল। রাজাও ঠিক সময়েই গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। সন্ন্যাসী রাজাকে শমীবৃক্ষটি দেখিয়ে দিল।

রাজা বেতালকে কাঁধে নিয়ে যখন নীরবে শ্মশানের দিকে আসছিলেন তখন বেতাল বলল, হে রাজন, পথশ্রম দূর করার জন্য একটি গল্প বল।

রাজা কিন্তু কোন কথা বললেন না। সন্ন্যাসী তাঁকে মৌন থাকতে বলেছিল।

বেতাল বলল, বুঝেছি, মৌনভঙ্গের ভয়ে তুমি কথা বলছ না। বেশ,

আমিই গল্প বলছি। তবে আমার গল্প শেষ হলেও তুমি যদি মৌনভঙ্গ না করো তাহলে তোমার মস্তক শতখণ্ড হবে।

এরপর তার গল্প আরম্ভ করল বেতাল।

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যবতী নামে এক সুরম্য নগরী আছে। যেখানে সুবিচারক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল ময়সেন।

একদিন রাজপুত্র ময়সেন বনে শিকার করতে গিয়ে একটি হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলে।

অনেক কষ্টে বন থেকে বেরিয়ে একটি নদীর ধারে যেতে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলো রাজপুত্রের।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলল, হে বিপ্র আমি পিপাসার্ত, আপনি আমার অশ্বটি একটু ধরুন। আমি নদী থেকে জলপান করে আসি।

ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে বলল, আমি কি তোমার চাকর নাকি যে একথা বললে আমায় ?

রাজপুত্র তখন রাগের মাথায় ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করল।

ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে অভিযোগ করতেই রাজা রাজপুত্রকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন।

মন্ত্রী রাজাকে বলল, রাজপুত্র সুখে মানুষ হয়েছে। তাকে গুরুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়।

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণদের পূজা করাই শাস্ত্রবিধি। কিন্তু রাজপুত্র হয়েও যে হাতে ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করেছে সে হাত কেটে ফেলা উচিত।

মন্ত্রী তাতে অসম্মত হলে রাজা নিজেই রাজপুত্রের হাত কাটতে উদ্যত হলেন। তখন সেই অভিযোগকারী ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন, হে রাজন। রাজপুত্র অজ্ঞানতাবশতঃ এই অন্যায় কাজ করেছে। আর একাজ কখনো করবে না। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা ক্ষমা করলেন রাজপুত্রকে। ব্রাহ্মণ চলে গেল যথাস্থানে।

গল্প শেষ করে বেতাল প্রশ্ন করল রাজাকে, রাজা এবং ব্রাহ্মণ—এই দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন রাজাই শ্রেষ্ঠ।

বেতাল রাজার উপর প্রসন্ন হয়ে বলল, তুমি শ্মশানে গিয়ে আমার পরামর্শমত সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম কিভাবে করতে হয় শিখিয়ে দিতে বলবে।

সে শুয়ে পড়ে দেখাতে গেলে তুমি তাকে হত্যা করবে। তাহলে অষ্টসিদ্ধি লাভ করবে।

রাজা তাই করলে বেতাল খুশি হয়ে বর দিতে চাইল।

রাজা বললেন, আমি যখনি ডাকব আমার সামনে এসে উপস্থিত হবে তুমি।

বেতাল তাই হবে, বলে চলে গেল। রাজাও স্বস্থানে চলে গেলেন।

পুতুল ভোজরাজকে বলল, এমন সাহস যদি আপনার থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে শেষ পুতুলটি বলল, হে রাজন, এই সিংহাসনে একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য বসার যোগ্য। তাঁর মত গুণবান রাজা সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তিনি দুষ্টের দমনও শিষ্টের পালন করতেন। তিনি বাহুবলে সারা পৃথিবী জয় করে একচ্ছত্র রাজা হয়েছিলেন। তিনি অকাতরে দরিদ্রদের ধনদান করে সকলের দারিদ্র্য মোচন করেন।

হে রাজন, আপনি ত রাজা বিক্রমাদিত্যের সকল গুণের কথা শুনলেন। যদি এইসব গুণ আপনার থাকে তাহলেই এই দিব্য সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মৌন হয়ে থাকায় বত্রিশটি পুতুল সমস্বরে তাঁকে বলল, হে রাজন, আপনিও একজন সাধারণ রাজা নন। আপনারা দুজনেই নারায়ণের অবতার। আপনার মত পবিত্রচরিত্র, কলাবিশারদ ঔদার্য গুণ সম্পন্ন রাজা বর্তমানে আর কেউ নেই। আপনার জন্য আমরা শাপমুক্ত হলাম। আমাদের শাপ ক্ষয় হলো।

ভোজরাজ তখন তাদের বললেন, তোমাদের শাপের কথা আমায় বল।

পুতুলরা বলতে লাগল, আমরা বত্রিশ দিব্যাঙ্গনা পার্বতীর সখী ছিলাম। দেবী আমাদের সকলকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাদের নাম মিশ্রকেশী, প্রভাবতী, সুপ্রভা ইন্দ্রসেবা, সুদতী, অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা,

হরিমধ্যা, অসমসুন্দরী, বিনাসবসিতা, শৃঙ্গারকণিকা, মন্মনজ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী, চিত্ররেখা, সুরতগহ্বরা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশীকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, কামরসিকা, ও উন্মাদিনী।

একদিন মহেশ্বর আমাদের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকালে তা দেখে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন আমাদের উপর। তিনি আমাদের অভিশাপ দিলেন, তোরা পুতুল হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করবি।

আমরা তখন ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে এই শাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলাম।

দেবী তখন বললেন, এক সময় রাজা বিক্রমাদিত্য যেই সিংহাসনে, উপবেশন করবেন। পরে রাজা ভোজরাজ ঐ সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে তোদের মুখ থেকে একে একে বিক্রমাদিতের অশেষ গুণ ও দানশীলতার কথা শুনবে এবং তখনই তোরা শাপমুক্ত হবি।

এই বলে ভোজরাজের অনুমতি নিয়ে শাপমুক্ত পুতুলগুলি স্বস্থানে চলে গেল।

এর পর ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করে অষ্টদলের উপর শিব পার্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন সেই থেকে প্রতিদিন ভক্তিভরে ষোড়শোপচারে তাঁদের পূজা করতেন তিনি।

তিনি ধর্মানুসারে প্রজাশাসন ও রাজ্যশাসন করতেন। তাঁর ধর্মে নিষ্ঠা দেখে পরম পরিতুষ্ট হন দেবী পার্বতী।

॥ সমাপ্ত ॥